POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ
فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ
فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا

এবং আমরা মানবমণ্ডলীর জন্য নিশ্চয় এই কুরআনে প্রত্যেক উপমা বিভিন্নভাবে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তবুও অধিকাংশ লোক অবিশ্বাস করা ব্যতিরেকে (সব কিছু) অস্বীকার করিল।

(বনী ইসরাঈল: ৯০)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 41

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 12 Oct, 2023 26 রবিউল আউয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

একজন মোমেন অপর মোমেনের জন্য এক ভবন সদৃশ, যার একাংশ অপর অংশকে দৃঢ়তা দান করে

২৪৪৫) হযরত বারাআ বিন আযিব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয় নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি সেই সব বিষয়গুলি বর্ণনা করেন যেগুলো করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ অসুস্থের খোঁজ খবর নেওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, কেউ হাঁচি দিলে তার উত্তর দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, অত্যাচারিতের সাহায্য করা এবং আমন্ত্রিত হলে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং কসম দানকারীর কসম পূর্ণ করা।

২৪৪৬) হযরত আবু মূসা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, একজন মোমেন অপর মোমেনের জন্য এমন এক ভবন যার একাংশ অপর অংশকে দৃঢ়তা দান করে। আর (একথা বলে স্পষ্ট করার জন্য) তিনি নিজের এক হাতের আঙুলগুলিকে অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করান।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ আগস্ট ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

সমস্ত মান-মর্যাদার চেয়ে অধিক ও উন্নত হচ্ছে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মান-মর্যাদা, যার প্রভাব ও কার্যকারিতা সারা ইসলামী দুনিয়ার উপরে বিস্তারিত। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পর আঁ হযরত (সা.) তাদের সহিত যে আচরণ করেছেন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় তাঁর (সা.) উন্নত চরিত্রের মহিমা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর সুউচ্চ মহান মর্যাদা

সমস্ত মান-মর্যাদার চেয়ে অধিক ও উন্নত হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর মান-মর্যাদা, যার প্রভাব ও কার্যকারিতা সারা ইসলামী জগতের উপরে বিস্তারিত। এবং তাঁর (সা.) সেই মান-মর্যাদাই পৃথিবীকে জীবন্ত করেছে। যে আরব দেশে ব্যাভিচার, মদ্যপান এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যে দেশে হাক্কুল ইবাদ বা মানবাধিকারকে খুন করা হয়েছিল, সহানুভূতি, পরোপকার প্রভৃতির নামচিহ্ন পর্যন্তও ছিল না; শুধু মানবাধিকার ও মানবপ্রেমই বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং হাক্কুল্লাহ বা খোদাপ্রেম ও আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য অধিকতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী আরোপিত হয়েছিল পাথর, বৃক্ষ-লতা ও নক্ষত্রাদির উপরে। বিভিন্ন প্রকারের শিরক বা অংশীবাদিতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্বল মানুষের এমনকি লজ্জাস্থান বা লিঙ্গেরও পুজো করা হত। এইরূপ ঘৃণিত জঘন্য অবস্থার চিত্র যদি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষের সম্মুখে ক্ষণিকের জন্যেও উন্মোচিত হয়, তাহলে সে এক বিপদসংকুল অন্ধকার অনাচার ও জুলুমের অতি ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পাবে। পক্ষাঘাত একদিকে আক্রমণ করে, কিন্তু এ এমন এক পক্ষাঘাত ছিল যা উভয় পার্শ্বকেই আক্রমণ করেছিল। দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও অনাচার সারা পৃথিবীকেই গ্রাস করে ফেলেছিল। না জলে শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল, না স্থলে। এই অন্ধকার ও বিভীষিকাময় যুগে সে দেশে আমরা দেখেছি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাব। তিনি এসে তুলাদণ্ডের উভয় প্রান্তকে সামান্তরাল অবস্থায় বা সুসংহত করে দিলেন এবং হাক্কুল্লাহ্ এবং হাক্কুল ইবাদকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অধিকার ও মানুষের অধিকারকে যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর চরিত্রের পূর্ণ প্রভাব ও কার্যকারিতা তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে, যখন ঐ যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। বিরুদ্ধবাদিরা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর এবং তাঁর অনুসারীদের উপরে যে অত্যাচার চালিয়েছে, এবং তাদেরই উপরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পর তিনি তাদের সহিত যে আচরণ করেছেন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় তাঁর (সা.) উন্নত চরিত্রের মহিমা।

আবু জাহল এবং তার সঙ্গীসাথীরা এমন কোন অত্যাচার বাকি রেখেছিল যা তারা করে নি আঁ হযরত (সা.) ও তাঁর আত্মোৎসর্গীত অনুসারীদের উপর? দারিদ্র জর্জরিত মুসলিম নারীদের উটের সঙ্গে বেঁধে দুই বিপরীত দিকে উটগুলোকে ছুটিয়ে দেওয়া হত এবং তারা চিরে দু'খণ্ড হয়ে যেতো। এবং এটা করা হতো শুধু এই কারণে যে, তারা কেন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর উপর ঈমান এনেছিল। কিন্তু, এর মোকাবেলায় চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে আঁ হযরত (সা.) মক্কা বিজয়ের পর لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেই আজ) (সূরা ইউসুফ, আয়াত:১৩) বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এ এমন এক চারিত্রিক ঔৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা যা আর কোন নবীর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ-

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ :৪৮৪)

পরিতাপের বিষয় হল মুসলমানেরা ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে বার বার জিহাদের ঘোষণা দিয়ে ইসলামের প্রভাবকে ক্ষুন্ন করেছে। পক্ষান্তরে যে সকল ইসলাম-হিতৈষী এসব বিষয় থেকে বাধা দিয়েছে তাদেরকে ইসলামের শত্রু তকমা দেওয়া হয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কাহাফ ২২ ও ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

অতঃপর এই আয়াতে এই জাতির উন্নতির যুগ সম্পর্কে একটি সংবাদ দেওয়া হয়েছে সেটা এই যে, এই জাতির মোকাবেলায় দাবি করবে না আর একথা বলবে না যে, আমরা কালকেই এদের ধ্বংস করে ফেলব, যদি না আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রদান না করেন। অর্থাৎ ইলহামের মাধ্যমে বলে দেন যে এদের সাথে এখন এই এই আচরণ হবে।

অনেকে এই আয়াতের অর্থ করেছে যে, হে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্! কোন কথা 'ইনশাআল্লাহ্' ব্যতিরেকে বলবে না। আর তারা এই আদেশ সম্পর্কে কিছু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যপূর্ণ রেওয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে যেখানে রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর সুস্পষ্ট সম্মানহানি হয়। অথচ এই আয়াতের শব্দগুলি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, এখানে ইনশাআল্লাহ্ বলার কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। যদি এই বিষয়টি হত, তবে শব্দগুলি হওয়া উচিত ছিল এমনটা- اِلَّآ اَنْ تَقُوْلَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু এখানে তো আল্লাহ্ তা'লা বলছেন- اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ অর্থাৎ উপরোক্ত বাক্য ততক্ষণ উচ্চারণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্

এরপর শেষের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

"মুঝকো কাফের কেহ কর আপনে কুফর পর করতে হ্যাঁ মোহর/
ইয়েহ তো হ্যায় সব শকল উনকি, হাম তো হ্যাঁ আয়না দার।
[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত মুনসিফ পত্রিকার পক্ষ থেকে আরোপিত জামাত আহমদীয়া মুসলেমার বিরুদ্ধে অপবাদসমূহের উত্তর। পর্ব-৩

সুদূর প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত কোন পাদ্রী আছে কি যে ঐশী নিদর্শন প্রকাশের বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে?

"বাহ্যিকভাবে খোদা তা'লা আমাকে ঐ প্রতাপ দান করেছেন যে, কোন পাদ্রী আমার মোকাবেলা করতে পারে না। ঐ এক যুগও ছিল যখন তারা হাটে বাজারে চিৎকার করে বলত যে, আঁ হযরত (সা.) এর কোন কোন মো'জেযা ছিল না এবং কুরআন শরীফে কোন ভবিষ্যদ্বানী নেই। তার খোদা তা'লা তাদের উপর এইরূপ প্রতাপ বিস্তার করেন যে, তারা এই দিকে আর মুখ বাড়ায় না, যেন তারা সকলে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। আমি ঐ সত্তার শপথ করছি, যার হাতে আমার প্রাণ আছে, যদি কোন পাদ্রী এই মোকাবেলার জন্য আমার দিকে মুখ বাড়ায় তবে খোদা তাকে ভয়ঙ্করভাবে লাঞ্ছিত করবেন এবং ঐ আযাবে নিক্ষিপ্ত করবেন, যা দৃষ্টান্তহীন হবে এবং যা কিছু আমি দেখাই তার শক্তি হবে না যে, সে তার কল্পিত খোদার শক্তি দ্বারা তা দেখাতে পারে। আমার জন্য খোদা আকাশ থেকেও নিদর্শন বর্ষিত করবেন এবং জমীন থেকেও। আমি সত্য বলছি যে, এই বরকত অন্য জাতিসমূহকে দেওয়া হয় নি। অতএব, পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এমন কোন পাদ্রী আছে কি, যে আমার মোকাবেলায় খোদায়ী নিদর্শন দেখাতে পারে? আমি ময়দান জিতে নিয়েছি। আমার মোকাবেলা করার দুঃসাহস কারো নেই।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৩৪৮)

হে ইউরোপ ও আমেরিকার পাদ্রীগণ! জীবিত কে? মহম্মদ নাকি মসীহ- তা নিয়ে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর।

"এস আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর যে, উভয় ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মসীহ এবং হযরত সৈয়্যদানা মহম্মদ মুস্তফা (সা.) এর আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণের বিচারে কে জীবিত।..... হে ইউরোপ ও আমেরিকার পাদ্রীগণ! কেন অহেতুক উচ্চবাচ্য কর? তোমরা জান যে, আমি একজন মানুষ যে কি না কোটি কোটি মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়। এস আমার আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর। তোমার ও আমার মাঝে এক বছরের সময় থাকবে। যদি এই সময়ের মধ্যে খোদার নিদর্শন এবং খোদার কুদরত প্রদর্শনকারী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তোমাদের দ্বারা প্রকাশিত হয় আর আমি তোমাদের থেকে দুর্বলতর সাব্যস্ত হই, তবে আমি স্বীকার করে নিব যে, মরিয়ম পুত্র ঈসা খোদা।কিন্তু যদি সেই সত্য খোদা, যাকে আমি জানি কিন্তু আপনারা জানেন না, তিনি আমাকে জয়যুক্ত করেন আর আপনাদের ধর্ম স্বর্গীয় নিদর্শন থেকে বঞ্চিত বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদের জন্য এই ধর্মকে গ্রহণ করা অনিবার্য হবে।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ১৬০)

প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সূরা ফাতেহার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি তওরাত ও ইঞ্জিলের নেই।

কুরআন, তওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষার তুলনা এবং কুরআনের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'তওরাত ও ইঞ্জিলের তুলনা কুরআনের সঙ্গে কিভাবে হতে পারে? এমনকি, কুরআন শরীফের কেবল প্রথম সূরার সঙ্গে তুলনা করতে চাইলেও তা সম্ভব হবে না। কারণ সূরা ফাতেহা, যার সাতটি মাত্র আয়াতের এই সূরাটি যাকে সূরা ফাতিহা নামে অভিহিত করা হয়ছে, তা এমন সুগঠিত, সুললিত, সুসমঞ্জস ও সসমন্বিত, তেমনি সুবিন্যস্ত ও হৃদয়গ্রাহী। ভাবের গভীরতা ও গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ এবং ভাষার লালিত্য ও মাধুরিমায় আপ্লুত এই সূরাতে সন্নিবেশিত রয়েছে শত শত সত্য, ধর্ম-তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশি যা মূসার কেতাব ও যীশুর কয়েক পৃষ্ঠার ইঞ্জিল থেকে আজীবন চেষ্টা করলেও পাওয়া যাবে না। এটা বৃথা বাগাড়ম্বর নয়, বরং পরম সত্য কথা। প্রকৃত কথা এটাই যে, যুক্তি ও তথ্যে পরিপূর্ণ জ্ঞানের পরিসরে সূরা ফাতেহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সাধ্য তৌরাত ও ইঞ্জিলের নেই। আমরা কি করতে পারি এবং কিভাবে সিদ্ধান্ত হতে পারে? পাদ্রী সাহেবগণ আমাদের কোন কথাই মানেন না। সত্যিই যদি তাঁরা তাঁদের তৌরাত ও ইঞ্জিলকে সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সত্যসমূহের বর্ণনায় এবং ঐশী-বাণীর গুণাবলী প্রকাশ বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ বলে মনে করেন, তাহলে আমরা পুরস্কার বাবদ ৫০০ পাঁচ শত টাকা তাঁদেরকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। যদি তাঁরা তাঁদের সমগ্র বিপুলায়তন প্রায় ৭০খানা পুস্তক হতে শরীয়তের ঐ সকল তত্ত্ব ও সত্য, সমন্বয় ও শৃঙ্খল-যুক্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানরত্ন ও ঐশীবাণীর বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেন, যা সূরা ফাতেহা হতে আমরা পেশ করব, তাহলে উক্ত অর্থরাশি তাদেরকে দেওয়া হবে। এই অর্থ অল্প হয়ে থাকলে আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব হয়, আমরা তাদের আবেদন পেয়ে, বৃদ্ধি করব।"

(খৃষ্টান সীরাজুদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৬০)

আমরা যারপরনায় আশ্চর্য হচ্ছি যে, যে ব্যক্তি খৃষ্টবাদের প্রবল সুনামিকে একক ক্ষমতা বলে হঠাৎ করে রুখে দিলেন, যিনি ইসলামের খোদাকে জীবিত খোদা এবং ইসলামের রূসল (সা.) কে জীবিত রসুল এবং ইসলামের কেতাব কুরআন করীমকে জীবিত কেতাব প্রমাণিত করলেন এবং খৃষ্টবাদের খোদা, তাদের রসুল ও কেতাবকে মৃত প্রমাণিত করলেন, তাঁর সম্পর্কে মৌলবীগণ বলছেন, তাঁকে খৃষ্টানরাই নাকি নিজেদের স্বার্থের জন্য দাঁড় করিয়েছিল। ইসলামের সেই মহাযোদ্ধা যে কিনা খৃষ্টবাদের ভ্রান্ত মতবাদকে খড়কুটোর মত উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে কি খৃষ্টানরা তাদের সঙ্গে মেলাতে পারে? ইংরেজরা নির্বোধ ছিল না কি এই মৌলবী সম্প্রদায় ও তাদের অন্ধ অনুসরণে মুনসিফ পত্রিকার সম্পাদক মিথ্যা বলছেন তা পাঠকগণ নিজেরাই বিচার করবেন।

মুনসিফ পত্রিকা আরও একটি আপত্তি তুলেছে তা হল এই যে, সৈয়্যদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ইংরেজদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক। আমরা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা একথা স্পষ্ট করেছি যে, এই আপত্তি নিতান্তই অসার, মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আপত্তি। এখন আমরা এই আপত্তির আরও একটি আঙ্গিকের উত্তর দিচ্ছি। অপবাদ দেওয়া হয় যে,মির্যা সাহেব ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করেছেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে নিষেধ করেছেন।

একথা একেবারে সঠিক যে, সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করেছেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের নামে বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, বিশৃঙ্খলা, খুনোখুনি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ ও মাহদীর মহান অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর কর্তব্য ছিল ইসলামের হৃত গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বকে পৃথিবীর বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং ইসলাম যে জীবিত ধর্ম, এর রসুল জীবিত রসুল এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এর কেতাব জীবিত কেতাব সে কথা অকাট্য যুক্তি ও দলিল দ্বারা প্রমাণিত করা। এর জন্য এমন এক সরকারের প্রয়োজন ছিল যেখানে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ করতে পারতেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞার অধীনে তিনি ইংরেজদের রাজত্বের অধীনে জন্মগ্রহণ করেন, যাদের ছত্রছায়ায় তিনি প্রচার ও প্রসারের কাজ অনেক দ্রুত ছড়িয়ে দিতে থাকেন। এমন স্বাধীনতা নিয়ে তিনি (আ.) পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ করতে পারতেন না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ইংরেজ সরকারের অনেক প্রশংসা করেছেন যে, সেই সরকার প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি প্রচার ও প্রসারেরও পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" আল্ মিনারের সম্পাদকের ন্যায় কোন কোন অজ্ঞ লোক আমার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া থাকে যে, 'এই ব্যক্তি ইংরেজ রাজ্যে বাস করে বলিয়া জেহাদ (ধর্ম-যুদ্ধ) নিষেধ করে।' এই মুর্খেরা কি এ কথা বুঝে না যে, আমি যদি মিথ্যা কথা দআবার এই গভর্নমেন্টকে খুশী করিতে চাহিতাম, তাহা হইলে কেন বারবার আমি এ কথা বলিতাম যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) ক্রুশ হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাভাবিকভাবে (কাশ্মীরের অন্তর্গত) শ্রী নগরে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন? তিনি খোদাও ছিলেন না এবং খোদার পুত্রও ছিলেন না। ধর্মপ্রাণ ইংরেজগণ কি আমার এই উক্তিতে অসন্তুষ্ট হইবেন না? অতএব হে অজ্ঞ ব্রক্তিগণ! শুনিয়া রাখ, আমি এই গভর্নমেন্টের কোন তোষামোদ করি না; বরং প্রকৃত কথা এই যে, যে গভর্নমেন্ট ইসলাম ধর্মে এবং ধর্মীয় রীতিনীতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না এবং স্বধর্মের উন্নতিকল্পে আমাদের প্রতি তরবারি চালায় না, এরূপ গভর্নমেন্টের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করা কুরআন শরীফের শিক্ষানুসারে নিষিদ্ধ; কেননা তাহারাও কোন

৯ ও ১২ পাতার পর.....

জুমআর খুতবা

বয়আতের দাবি পূর্ণ করা কোন সাধারণ বিষয় নয়। এটা তখনই হতে পারে যখন আমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা আদেশাবলীর অধীনে চলার চেষ্টা করব।

জলসা আয়োজনের অনেক বড় একটি উদ্দেশ্য, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের অবহিত করেছেন আর একান্ত বেদনার সাথে এর বহিঃপ্রকাশও করেছেন তা হলো, তাঁর হাতে বয়আতকারীরা যেন ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে, আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হয়, তাঁর (সা.) সাথে যেন ভালোবাসার সম্পর্ক সম্পর্ক হয়। জগতের মোহ যেন উবে যায় আর ধর্ম অগ্রগণ্য হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা অনুযায়ী নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করার পাশাপাশি আমাদের সন্তানদেরও ধর্মের সাথে সংযুক্ত রাখার বিশেষ চেষ্টা করেছি? যদি তা করে থাকি তাহলে এটিই সেই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে যা শতবর্ষ পূর্তিতে আমরা আদায় করব এবং প্রত্যেক আহমদীর কাছে এটিই প্রত্যাশা। যদি তা না হয় তাহলে কেবল জাগতিক রীতি অনুযায়ী শতবর্ষ পূর্তিতে উৎসব করা অর্থহীন।

যে কোনো বিষয় হোক, সর্বদা ধর্মকে প্রাধান্য দাও। ইহজগত যেন মূল লক্ষ্য না হয়। ধর্ম যেন আসল উদ্দেশ্য হয়। তখন জাগতিক কাজও ধর্মীয় বলে গণ্য হবে।

যে নিজের জ্ঞানের উন্নতি চায় তার উচিত কুরআন শরীফকে অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা।

আমাদের যাচাই করা দরকার যে, কতজন অভিনিবেশ সহকারে কুরআন করীম পাঠ করে, তিলাওয়াত করে এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা করে।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যেক আহমদীকে কুরআন করীমের প্রয়োগ করা উচিত। এটি একদিকে যেমন আমাদের তরবীয়তের জন্য পথনির্দেশনা, তেমনি অপরদিকে অমুসলিমদের আপত্তিসমূহের উত্তর দেওয়ার জন্যও একটি শক্তিশালী অস্ত্র।

প্রত্যেক আহমদীর যাচাই করা উচিত যে তার নামায কোন অবস্থায় রয়েছে। যদি আমাদের এই অবস্থাটি সঠিক হয়ে যায় আর আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সেভাবে সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায় তবে এটিই হবে সেই অবস্থা যখন আমরা প্রকৃত আনন্দ লাভ করব।

যদি আমরা ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি মনোযোগী হই তবে খোদা তা'লার সত্তার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতি করব। এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের সত্যতার প্রতি ঈমানও আমাদের সমৃদ্ধ হবে এবং আমরা নিজেদের সন্তানদের ঈমান রক্ষাকারী হব।

'যারা আমাকে অস্বীকার করেছে, আমার উপর আপত্তি করেছে, তারা আমাকে সনাক্ত করতে পারে নি। আর যারা আমাকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও আপত্তি করে, তারা আরও বেশি হতভাগা। কেননা, তারা দেখেও অন্ধ সাজে।

আমার আগমনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আমি যেন তৌহিদ (তথা একত্ববাদ), আখলাক (চারিত্রিক গুণাবলী) এবং রূহানিয়্যত (তথা আধ্যাত্মিকতা) বিস্তার করি।

আগামী শতাব্দীর লক্ষ্য হলো এসব সংক্ষিপ্ত কর্ম -পরিকল্পনা যা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে বর্ননা করেছি। আমরা এ দাবী নিয়ে দাড়িয়েছি যে আমাদেরকে পৃথিবীবাসীর হৃদয় জয় করতে হবে। পৃথিবীবাসীকে খোদা তা'লার একত্বে বিশ্বাসী বানাতে হবে। পৃথিবীবাসীকে মহানবী (সা.)-এর পদতলে সমবেত করতে হবে। সুতরাং এই দিক থেকে আমাদের প্রত্যেককে নিজের আত্মপর্যালোচনা করতে হবে এবং একটি নতুন সংকল্পের সাথে আহমদীয়া জামা'ত জার্মানীকে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করতে হবে অর্থাৎ আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের এ উদ্দেশ্যকে অর্জনের পূর্ণ চেষ্টা করব এবং নিজ সন্তানদের ও বংশধরদেরও এ উপদেশ দিতে থাকব এবং তাদের এমনভাবে তরবিয়ত করব যেন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের এ জাগরন এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১ম সেপ্টেম্বর , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (১ তবুক ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আলহামদুলিল্লাহ্, আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জার্মানীর সালানা জলসা চার বছরের বিধিনিষেধের পর বিশাল পরিসরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে জলসার উদ্দেশ্য অর্জনকারী করুন। আর সবাই এতেই যেন সন্তুষ্ট না হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুনরায় একত্রিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন তাই পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করব, কিছু বৈঠক করব আর তা-ই যথেষ্ট। না, বরং জলসা আয়োজনের অনেক বড় একটি উদ্দেশ্য, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের অবহিত করেছেন আর একান্ত বেদনার সাথে এর বহিঃপ্রকাশও করেছেন তা হলো, তাঁর হাতে বয়আতকারীরা যেন ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে, আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হয়, তাঁর (সা.) সাথে যেন ভালোবাসার সম্পর্ক সম্পর্ক হয়। জগতের মোহ যেন উবে যায় আর ধর্ম অগ্রগণ্য হয়।

তিনি (আ.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, এই অধমের হাতে বয়আতকারী সকল নিষ্ঠাবানের কাছে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বয়আত করার উদ্দেশ্য হলো জগতের মোহ যেন লোপ পায় যায় আর নিজ দয়ালু প্রভু এবং (আল্লাহ্‌র) প্রিয় রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা যেন প্রাধান্য পায়। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতকারীদের প্রথম চেষ্টা এটি হওয়া উচিত যে, আমরা যেন সেসব নিষ্ঠাবানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) -এর প্রতি ভালোবাসা প্রাধান্য লাভ করে আর আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজে এর বহিঃপ্রকাশও যেন হয়।

এ বছর জার্মানীতে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার শত বছর পূর্ণ হয়েছে। জার্মান জামা'তের সদস্যরা এর জন্য বেশ উদ্বেলিত এবং আনন্দিতও যে, আমরা এ বছর (জার্মানীতে) জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জলসা করছি । এটি এখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার শত বছর পূর্তির জলসা। বহু মানুষ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করছে। এটি অবশ্যই আনন্দের বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'লা আজ থেকে শত বছর পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এ দেশে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বরং তাঁর জীবদ্দশাতেই এখানে বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল। তাই বার্তা আসার তো এখন শত বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু একই সাথে আমাদের এটিও দেখতে হবে আর ভাবতে হবে যে, এই শত বছরে আমরা কী অর্জন করেছি? আমরা আমাদের ঈমানের কতটা সুরক্ষা করেছি?

এখানে যখন জামা'তের সূচনা হয়েছে তখন গুটিকতক লোক ছিল। এরপর পাকিস্তানের অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তিত হয়। তখন বহু আহমদী এ দেশে এসে বসবাস আরম্ভ করে। তারা এখানে এজন্য এসেছে কেননা তারা আহমদী ছিল আর আহমদী হওয়ার কারণে নিজ দেশে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের শিক্ষার ওপর আমল করা এবং প্রকাশ্যে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। অতএব যখন এখানে এসে তারা এই ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে যে, তারা প্রকাশ্যে স্বীয় ধর্মের ওপর আমল করতে পারে, তখন তাদের এক বিশেষ পরিশ্রমের সাথে নিজেদের অবস্থায় সেসব পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে এরপর সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করা উচিত যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামা'তের কাছে প্রত্যাশা করেছেন। আমরা কী সেই চেষ্টা করেছি?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা অনুযায়ী নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করার পাশাপাশি আমাদের সন্তানদেরও ধর্মের সাথে সংযুক্ত রাখার বিশেষ চেষ্টা করেছি? যদি তা করে থাকি তাহলে এটিই সেই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে যা শতবর্ষ পূর্তিতে আমরা আদায় করব এবং প্রত্যেক আহমদীর কাছে এটিই প্রত্যাশা। যদি তা না হয় তাহলে কেবল জাগতিক রীতি অনুযায়ী শতবর্ষ পূর্তিতে উৎসব করা অর্থহীন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অসংখ্য স্থানে তাঁর (হাতে) বয়াতকারীদের নিজেদের মাঝে পবিত্র ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য কর্মপদ্ধতি প্রদান করেছেন। তিনি তাদেরকে নসীহত করেন যে, আমরা যদি প্রকৃত অর্থে সেই নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকি যারা তাঁর হাতে বয়আত করেছে তাহলে আমাদের সর্বদা সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে থাকা উচিত। আর এরপর নিজেদের কথা ও কাজের তার সাথে যাচাই করতে থাকা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর (হাতে) বয়াত গ্রহণের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য আমরা কতটা পূর্ণ করছি?কোথাও আমরা এই উন্নত বিশ্বে এসে আমাদের সেই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাই নি তো ? কোথাও পার্থিব চাকচিক্য আমাদেরকে বয়াতের উদ্দেশ্যকে ভুলিয়ে দেয়নি তো? যদি ভুলিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে এই শতবর্ষীয় উদযাপন নিরর্থক।

আমাদের (বয়াত গ্রহণের) উদ্দেশ্যের প্রতি পথনির্দেশকারী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর কিছু উদ্বৃতি এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যেগুলো আমাদেরকে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি পথনির্দেশ দান করে।

সর্বপ্রথম আমি তাঁর (আ.) এই বক্তব্য উপস্থাপন করব যাতে তিনি (আ.) বলেছেন যে, আমাদের বয়আত আমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করে?

তিনি (আ.) বলেন-"এই ধারণা কোরো না যে, কেবল বয়আত গ্রহণের মাধ্যমেই খোদা সন্তুষ্ট হয়ে যান। এটি তো কেবল খোলস মাত্র, বহিরাবরণ মাত্র, মূল শাঁস তো এর অভ্যন্তরে বিদ্যমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিধান এটিই যে, একটি খোলস থাকে আর মূল শাঁস তার ভেতরে থাকে। খোলস কোনো কাজের জিনিস নয়, মূল শাঁসই গ্রহণ করা হয়। কতিপয় এমন হয়ে থাকে যে, তাদের মাঝে মূল শাঁস থাকেই না আর তারা মুরগির অপুষ্ট ডিমের মতো যাতে না থাকে কুসুম আর না থাকে কোনো সাদা অংশ। যা কোনো কাজে আসে না এবং আবর্জনার মতো ছুড়ে ফেলা হয়। হ্যাঁ! এক দুই মিনিটের জন্য কোনো শিশুর খেলার উপকরণ হলে হতে পারে। অনুরূপভাবে যে-ব্যক্তি বয়আত (গ্রহণ) ও ঈমানদার হওয়ার দাবি করে সে যদি উক্ত দুটি বিষয়ের শাঁস নিজের মাঝে না রাখে তাহলে তার ভীত হওয়া উচিত যে, এমন এক সময় আসছে যখন সে সেই অপুষ্ট ডিমের মতো সামান্য আঘাতে চূর্ণ -বিচূর্ণ হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। যারা জামা'ত থেকে দূরে সরে যায় তাদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে যে-ব্যক্তি বয়আত (গ্রহণের) ও ঈমানদার হওয়ার দাবি করে তার খতিয়ে দেখা উচিত যে, আমি কি খোসা সর্বস্ব নাকি শাঁস?" নিজের আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত।

"যতক্ষণ শাঁস সৃষ্টি না হবে- ঈমান, ভালোবাসা, আনুগত্য, বয়আত, বিশ্বাস, শিষ্যত্ব, মুসলমান হওয়ার দাবি সত্যিকার দাবি নয়। স্মরণ রেখো! একথা সত্য যে, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে মূল শাঁস ব্যতীত খোলসের কোনো মূল্য নেই।

ভালোভাবে স্মরণ রেখো! মৃত্যু কখন উপস্থিত হবে তা কারো জানা নেই, কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, মৃত্যু অনিবার্য। অতএব, বুলিসর্বস্ব দাবির ওপর মোটেই নির্ভর কোরো না এবং আনন্দিত হয়ে যেয়ো না, তা কখনোই কল্যাণদায়ী বিষয় নয়। যতক্ষণ মানুষ নিজের ওপর বহু মৃত্যু আনয়ন না করবে এবং বহু পরিবর্তন এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত না হবে সে মনুষ্যত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ পারে না।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৭)

সুতরাং, বয়আতের দায়িত্ব পালন করা কোনো সামান্য বিষয় নয়। এটি তখনি পালিত হবে যখন আমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে চলার চেষ্টা করব। জাগতিক আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করার ফলেই মানুষ এমন মর্যাদা অর্জন করতে পারে। জাগতিকতার মাঝে থেকেও ধর্মকে প্রধান্য দান করাই হচ্ছে প্রকৃত জিহাদ এবং আমাদের এ বিষয়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা আমাদের করা উচিত।

ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ কী? জাগতিকতাকে কি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে? এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমার কথার অর্থ আদৌ এটি নয় যে, মুসলমানরা অলস হয়ে যাক। ইসলাম কাউকে অলস বানায় না। নিজেদের ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং চাকরিতেও ব্যস্ত থাকো, খোদার জন্য তোমাদের কোনো সময় থাকবে না - এ আমার পছন্দ নয়। হ্যাঁ, ব্যবসার সময় অবশ্যই ব্যবসা করো আর খোদা তা'লার ভয় এবং ভীতিকে তখনও দৃষ্টিপটে রাখো যেন সেই ব্যাবসাও ইবাদতের রঙ ধারণ করে। নামাযের সময় হলে নামায পরিত্যাগ করো না।

যে কোনো বিষয় হোক, সর্বদা ধর্মকে প্রাধান্য দাও। ইহজগত যেন মূল লক্ষ্য না হয়। ধর্ম যেন আসল উদ্দেশ্য হয়। তখন জাগতিক কাজও ধর্মীয় বলে গণ্য হবে।

সাহাবায়ে কেরামগণকে দেখো! তারা কঠিন থেকে কঠিনতর সময়েও খোদাকে পরিত্যাগ করেন নি। যুদ্ধ ও অসি চালনার সময় এমন ভয়াবহ সময় হয়ে থাকে যে, কেবল এর কল্পনাতেই মানুষ ঘাবড়ে যায়। সেই সময় যা কিনা উত্তেজনা এবং ক্রোধের সময় হয়ে থাকে, এমন অবস্থাতেও তারা খোদা তা'লার প্রতি উদাসীন হন নি। নামায পরিত্যাগ করেন নি বরং দোয়ার মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি করেছেন। এটি একান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মানুষ এমনিতে সকল শক্তি প্রয়োগ করে, বড় বড় বক্তৃতা করে, জলসার আয়োজন করে এ উদ্দেশ্যে যে, মুসলমানরা উন্নতি করবে। কিন্তু খোদার প্রতি তারা এতটা উদাসীন হয়ে গেছে যে, ভুলেও তারা এদিকে দৃষ্টি দেয় না। এ হলো সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা। তাহলে এমন অবস্থায় কীভাবে আশা করা যায় যে, তাদের প্রচেষ্টা ফল বয়ে আনবে যেখানে তাদের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা ইহজগত অর্জনের জন্য হয়ে থাকে। স্মরণ রেখো! যতদিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার না করবে আর নিজ সত্তার প্রতিটি কণায় ইসলামের জ্যোতি ও রাজত্ব না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো উন্নতি হবে না। এটি নিশ্চিত বিষয়। যদি তোমরা পশ্চিমা জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো যে, তারা উন্নতি করছে, তাদের বিষয় ভিন্ন। তোমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে। তোমাদের জন্য দলিল পূর্ণ হয়ে গেছে। তাদের জন্য পৃথক বিষয় এবং পাকড়াও এর দিন নির্ধারিত রয়েছে। তাদের পাকড়াও কীভাবে হবে, কখন হবে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সামনে জবাবদিহি করতে হবে এবং এটি অবশ্যই হবে, কিন্তু হতে পারে তা আল্লাহ্ তা'লা তাদের মৃত্যুর পর করবেন, ইহজগতে হয়তো করবেন না। কিন্তু আমরা যারা ঈমান আনার দাবি করি, এরপরও যদি আমরা আমল না করি তাহলে ইহজগতেই আমাদের পাকড়াও আরম্ভ হতে পারে। তাই বড়ই চিন্তার বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পরিত্যাগ করো তাহলে এ পৃথিবীতেই তোমাদের জন্য জাহান্নাম রয়েছে।

এমন অবস্থায় যখন কিনা প্রায় প্রতিটি শহরে মুসলমানদের কল্যাণের জন্য আঞ্জুমান এবং কনফারেন্স হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের শুভাকাঙ্ক্ষী কারো মুখ থেকে একথা বের হয় না যে, কুরআনকে তোমাদের ইমাম বানাও, এর ওপর আমল করো।

যদি কিছু বলে তো কেবল এতটুকু যে, ইংরেজী পড়ো, কলেজ বানাও, ব্যারিষ্টার হও। এটি থেকে বুঝা যায় যে, খোদা তা'লার প্রতি ঈমান নেই। দক্ষ চিকিৎসকও দশদিন পর যদি ঔষধ কাজ না করে তাহলে স্বীয় চিকিৎসা পরিবর্তন করে। এক চিকিৎসা পরিবর্তন করে অন্য চিকিৎসা আরম্ভ করে দেয়। আর এখানে ব্যার্থতার পর ব্যার্থতা দেখে কিন্তু তারপরও সেখান থেকে ফিরে আসে না। খোদা যদি না থেকে থাকেন তাহলে তাঁকে ছেড়ে নিঃসন্দেহে তারা উন্নতি করতে পারে। কিন্তু যেখানে খোদা আছেন আর অবশ্যই আছেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে ছেড়ে কখনোই উন্নতি হতে পারে না। আল্লাহ্‌র অসম্মান করে, তাঁর কিতাবের প্রতি বেয়াদবি করে তারা সফল হতে ও জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তা কখনো হবে না।"

অমুসলিমরা কুরআন পোড়ানোর সাহস কীভাবে পেল? একারণে যে, আমরা কার্যত পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছি আর এ কারণেই তারা এই সাহস পেয়েছে, যার ফলে আমরাও গুনাহগার হয়েছি। মুসলমানরা গুনাহগার হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, আমার মত এটিই যা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে, উন্নতির একমাত্র পথ হলো খোদাকে চেনা এবং তাঁর প্রতি জীবন্ত ঈমান সৃষ্টি করা। যদি জগৎপূজারীদের বৈঠকে আমরা এ কথাগুলো বর্ণনা করি তখন তারা তা হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের করুণা হয়। বড়ই পরিতাপ যে, তারা তা দেখতে পায় না যা আমরা দেখতে পাই।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮-১৫৯)

তিনি বলেন, আমি তো এমন দৃষ্টিতে দেখছি যে, যদি পবিত্র কুরআনের ওপর আমল না করে তাহলে মুসলমানদের উপর্যুপরি ধ্বংস অনিবার্য।

অতএব মুসলমানের পরিচয় নিয়ে দ্বিমুখী আচরণ চলতে পারে না। মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থার চিত্র আমাদের জন্য যথেষ্ট শিক্ষনীয়। তারা ধর্মের নাম উচ্চারণ করে ঠিকই কিন্তু কথা বলে সব বস্তুবাদিতাপূর্ণ। যার ফলাফল হলো এই যে, জাতি হিসেবে সর্বত্র মুসলমানদের অবস্থা করুণ। অতএব এটি বড়ই প্রণিধানের বিষয় এবং চিন্তার বিষয়।

অতঃপর ধর্মকে সর্বাবস্থায় জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য রাখার বিষয়ে তিনি (আ.) আরো এক স্থানে এভাবে বলেছেন, লক্ষ্য করো! দুই ধরনের মানুষ রয়েছে। এক প্রকার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্য ও পেশায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শয়তান তাদের মাথায় ভর করে বসে। আমার কথার অর্থ এটি নয় যে, ব্যবসা করা নিষেধ। পূর্বেও স্পষ্ট করা হয়েছে। সাহাবীরাও ব্যবসা করতেন কিন্তু ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেছেন যা তাদের হৃদয়কে অন্দোলিত করেছে। একারণেই তারা কোনো ক্ষেত্রেই শয়তানের আক্রমণে বিচলিত হন নি।" অতএব এটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য নীতিগত আদর্শ।

"কোনো বিষয় তাদেরকে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত রাখতে পারে নি। নিজ ধর্মকে লুকানো উচিত নয়। তিনি (আ.) বলেন, এ দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি, যারা কেবল জগতের বান্দা ও দাসে পরিণত হয় এমনকি জগৎপূজারি হয়ে যায় এমন মানুষকে শয়তান নিজ প্রভাব ও আয়ত্বে নিয়ে নেয়। আরেক ধরনের লোক হয় যারা ধর্মের উন্নতির চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। এটি সেই দল যাদে রকে 'হিযবুল্লাহ্'(অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দল) বলা হয় আর যারা শয়তান ও তার বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করে। জাগতিক হিযবুল্লাহ্ নয় যারা ঝগড়াঝাঁটি করে, মারামারি করে। এটি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী দল যাদেরকে হিযবুল্লাহ্ বলা হয় যারা শয়তান এবং তার দলের বিপরীতে বিজয় লাভ করে থাকে। সম্পদ যেহেতু এক প্রকার ব্যবসা অর্থাৎ ব্যবসা করার ফলে বৃদ্ধি পায়, তাই আল্লাহ্ তা'লা-ও ধর্মাকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মোন্নতির ইচ্ছাকে একটি ব্যবসা আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ অর্থাৎ আমি কি এমন এক বাণিজ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করব যা এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে তোমাদের রক্ষা করবে? (আস -সাফফ: ১১) ধর্মের বাণিজ্য কী? তিনি (আ.) বলেন, সর্বোত্তম ব্যাবসা হলো ধর্মের যা যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করে। অতএব আমিও খোদা তা'লারই ভাষায় তোমাদের বলছি, هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ আমি তার প্রতি অধিক আশা রাখি যে ধর্মের উন্নতির স্বল্প আকাঙ্ক্ষা করে না। যে-ব্যক্তির এ আগ্রহে ভাটা পড়ে আমার ভয় হয় পাছে শয়তান তাকে প্রভাবিত না করে বসে। একারণে কখনো অলস হওয়া উচিত নয়। প্রতিটি বিষয় যা বু ঝা যায় না সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত যাতে তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। জিজ্ঞেস করা নিষেধ নয়। অস্বীকার করা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করা উচিত এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যও। কোনো বিষয় যদি অস্বীকারও করো তবুও জিজ্ঞেস করো। প্রশ্ন তো করো। উত্তর তো জানো এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যও জিজ্ঞেস করা উচিত।

"যে-ব্যক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চায় তার উচিত মনোযোগের সাথে কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করা। যেখানে বুঝবে না সেখানে জিজ্ঞেস করুন। কোনো তত্ত্বকথা যদি বুঝতে না পারেন তবে অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে উপকৃত হোন। কুরআন শরীফ একটি ধর্মীয় সমুদ্র যার স্তরে স্তরে অনেক দুর্লভ ও অমূল্যবান মণিমুক্তা বিদ্যমান।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৩-১৯৪)

অতএব ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন করীমের পথনির্দেশনা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং এই কুরআন করীমই প্রকৃত পথনির্দেশনা প্রদান করবে। আর এ পদ্ধতিই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য রাখার নির্দেশনা প্রদান করবে। অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, কতজন রয়েছেন যারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন করীম পড়েন, এটি তিলাওয়াত করেন এবং তারপর সেটির ওপর আমল করার চেষ্টা করেন।

আমাদের প্রতি কুরআন শরীফ-এর অনেক অনুগ্রহ রয়েছে, তাই এটিকে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে পড়া উচিত- এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (আ.) বলেন,

"স্মরণ রাখা উচিত, কুরআন শরীফ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং নবীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে যা তাদের কেচ্ছাকাহিনীরূপে বর্ণিত শিক্ষামালাকে শিক্ষণীয় রূপ দান করেছে। আমি সত্য সত্য বলছি, কেউ এসব কিসসা কাহিনির মাধ্যমে নাজাত (মুক্তি) লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কুরআন শরীফ পাঠ করবে কেননা কেবল কুরআন শরীফেরই এই মর্যাদা রয়েছে যে, اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌ ۙ وَّمَا هُوَ بِالۡهَزۡلِ অর্থাৎ নিশ্চয় এটি (কুরআন) ফয়সালাকারী কালাম। এবং এটি কোনো অবান্তর কালাম নয়। এটি মানদণ্ড, তত্ত্বাবধায়ক, জ্যোতি, নিরাময় এবং অনুগ্রহস্বরূপ। যারা কুরআন পাঠ করে এবং এটিকে কিচ্ছাকাহিনি মনে করে তারা প্রকৃতপক্ষে কুরআন শরীফ পাঠ করে নি বরং এর অমর্যাদা করেছে। বিরোধীরা আমাদের বিরোধীতায় এতটা তীব্র হয়েছে? কেবল এ কারণেই যে, আমরা কুরআন শরীফকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশমত কুরআনকে সর্বৈব জ্যোতি , প্রজ্ঞা এবং মা'রেফাতস্বরূপ (আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান) উপস্থাপন করতে চাই উপরন্তু তারা চেষ্টা করে কুরআন শরীফকে যেন একটি সাধারণ রূপকথার চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া না হয়, যা আমরা সইতে পারি না।

খোদা তা'লা আপন অনুগ্রহে আমাকে বিষয়টি বুঝিয়েছেন যে, কুরআন শরীফ একটি জীবিত ও জ্যোতির্মণ্ডিত পুস্তক। কাজেই আমি কেন এর বিরোধিতার পরোয়া করব? তাইতো যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদেরকে আমি বারবার এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি যে, খোদা তা'লা এই জামা'তকে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য, সত্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছেন, কেননা এটি ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে কোন আলোক এবং জ্যোতি থাকতে পারে না আর আমি চাই, ব্যবহারিক সত্যতার মাধ্যমে যেন ইসলামের সৌন্দর্য পৃথিবীময় প্রকাশিত হয়। যে লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এজন্য প্রচুর পরিমাণে কুরআন শরীফ পাঠ কর কিন্তু নিছক কিচ্ছা বা রূপকথা মনে করে নয় বরং একটি দর্শনতত্ত্ব মনে করে।"
(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

অতএব কুরআন করীমকে অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। অধিকাংশ আহমদী অনেক প্রশ্ন করে। তারা যদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পাঠ করে তাহলে সেখানেই তাদের উত্তর পেয়ে যাবেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যখন কুরআন শরীফের বরাতে আলোচনা করা হয় তখন শ্রোতাবৃন্দ প্রভাবিত হয়। তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে আস্থা সহকারে কু রআন করীমকে ব্যবহার করা উচিত। এটি আমাদের তরবিয়তের জন্য দিকনির্দেশনার পাশাপাশি অন্যদের আপত্তির জবাব দেওয়ার জন্য জোরালো হাতিয়ারস্বরূপ।

ধর্মকে বস্তুবাদিতার ওপর প্রাধান্য দানকারীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, খোদা তা'লার সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন করা। আদেশ সম্পর্কে জানার পর আদেশ প্রদানকারী খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। এই সম্পর্ক ইবাদতের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং ইসলাম ধর্মে ইবাদতের সর্বোত্তম উপায় হলো নামায। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যে, তার নামাযের কী অবস্থা! আমাদের এই অবস্থা যদি শুধরে যায় আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের এমন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে আনন্দিত হব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, যে ব্যক্তি দৈবপাত থেকে নিরাপদ থাকতে চায় সে যেন খোদা তা'লার সাথে সন্ধি স্থাপন করে আর নিজের এতটা পরিবর্তন করে ফলে স্বয়ং উপলব্ধি করে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যে , আমি সেই ব্যক্তি নই। খোদা তা'লা কুরআন করীমে বলেন, إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনো কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। (সূরা রাআদ; ১২) তিনি (আ.) বলেন, সত্য ধর্মের মূল হলো খোদার প্রতি ঈমান। খোদার প্রতি ঈমান প্রকৃত পরহেযগারি, খোদার ভয় প্রত্যাশা করে।

খোদা তা'লা মুত্তাকী (খোদাভীরু) ব্যক্তিকে বিনষ্ট করেন না। উর্ধ্বলোক থেকে তিনি তাকে সাহায্য করেন। ফেরেশতারা তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন। মুত্তাকী ব্যক্তির মাধ্যমে মু 'জিযা (অলৌকিক নিদর্শন) প্রকাশিত হয়– এর চেয়ে বড়ো বিষয় আর কী! মানুষ যদি খোদা তা'লার সাথে পরিপূর্ণরূপে স্বচ্ছ হয় আর তাঁর অসন্তুষ্টিমূলক কাজকর্ম পরিহার করে তাহলে সে জেনে নিক, প্রতিটি কাজ কল্যাণমণ্ডিত হবে। আমার ঈমান তো ঐশী কার্যবিধায়কের ওপরেই। উর্ধ্বলোক থেকেই কার্যক্রম পরিচালিত হবে আর কোনো উপায় নেই। একথা সত্য, যদি খোদা তা'লা কারো হয়ে যান গোটা পৃথিবী বিরোধিতা করে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'লা যাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন, তাকে কে ক্ষতি পৌঁছাতে পারে? সুতরাং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়া আবশ্যকীয়। তিনি (আ.) বলেন, অতএব আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়া আবশ্যকীয়। আর এই নির্ভরতা এমন হতে হবে, যেন সে প্রতিটি বিষয় হতে পরিপূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যায়। উপকরণ তো আবশ্যকীয় তবে উপকরণের সৃষ্টি আল্লাহর হাতে। তিনি প্রত্যেক ধরনের উপকরণ সৃষ্টি করতে পারেন। এ জন্য উপকরণের উপর নির্ভর করো না। নামাজে নিয়মিত হও এবং নিয়মিত দোয়া করো তবেই এরূপ নির্ভরতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ধরনের পদস্খলন হতে বাঁচতে হবে এবং এক নতুন জীবনের ভিত্তি রচনা করতে হবে। মনে রেখো! আত্মীয়রাও এমন আপন হয় না যেমনটি আল্লাহ তা'লা আপন হয়ে থাকেন। তিনি সন্তুষ্ট হলে গোটা পৃথিবী সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

কারো প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হলে বক্র উপকরণকে সোজা করে দেন। বিফলে যাওয়া কর্মও সঠিক হয়ে যায়। ক্ষতিকারককে কল্যাণদায়ক বানিয়ে দেন। এটাই হলো আল্লাহর রাজত্ব। হ্যাঁ! একথা মনে রাখতে হবে, যার জন্য দোয়া করা হয়ে থাকে তাকেও নিজের সংশোধনের প্রতি মনযোগী হওয়া আবশ্যকীয়। "সে যদি কোনো আঙ্গিকে আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে তবে দোয়ার প্রভাব সৃষ্টি হওয়ার পথে সে প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত হয়।

সুন্নত অনুযায়ী উপকরণের সাহায্য নেওয়া পাপ নয়। তবে আল্লাহ তা'লাকে অগ্রগণ্য রাখতে হবে। সে যেন এমন উপকরণের সাহায্য না নেয় যা আল্লাহ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৪-১৮৫)

নামাযে স্বাদ না পাওয়া ও এর নিরাময় সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, যাহোক আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, আল্লাহ তা'লা নামাযে যে স্বাদ ও তৃপ্তি রেখেছেন তা হতে অজ্ঞ হবার কারণে, মানুষ নামায হতে অসতর্ক ও অলস। এটাই হলো সবচেয়ে বড়ো কারণ। তাছাড়া শহরে ও গ্রামেগঞ্জে তো (নামাযের বিষয়ে) আরো বেশি অলসতা ও গাফেলতি হয়ে থাকে। সুতরাং পঞ্চাশ শতাংশ মানুষও পূর্ণ মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে নিজ প্রকৃত উপাসকের সামনে মাথা নত করে না। এরপর প্রশ্ন ওঠে, তারা কেন এ স্বাদ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তারা কেনইবা কখনোই এর স্বাদ পায় নি? অন্য ধর্মে এমন শিক্ষা নাই। কখনো এমন হয়ে থাকে যে, একদিকে মুআজ্জিন আযান দিচ্ছে আর অপরদিকে আমরা আমাদের কাজে ব্যস্ত। তাছাড়া তারা তা (অর্থাৎ আযান) শুনতেও চায় না যেন তাদের মনকষ্ট হয়ে থাকে যে, আযান হয়ে গেছে এখন আমাদের নামাযে যেতে হবে। এমন মানুষ তো দয়ার পাত্র। এখানেও এমন মানুষ আছে যাদের দোকান মসজিদের নীচে। কিন্তু তারা কখনো (মসজিদে গিয়ে) নামাযের জন্য দাঁড়ায় না। অতএব আমি বলতে চাই, অত্যন্ত মনোতাপ ও আবেগের সাথে এ দোয়া করা উচিৎ যে, হে আল্লাহ্! যেভাবে ফলফলাদি এবং বিভিন্ন বস্তুকে তুমি স্বাদ প্রদান করেছ সেভাবে নামায ও ইবাদতের স্বাদ তুমি আমাকে একবার পাইয়ে দাও। খেলে পরে (খাদ্যের স্বাদ) মনে থাকে। লক্ষ্য করে দেখ, কোনো ব্যক্তি কোনো একটি সুন্দর বিষয়কে আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে দেখলে সে সেটাকে মনে রাখে। আর কোনো অসুন্দর ও অপছন্দনীয় বিষয়কে দেখলে, সেটি মূর্তিমান হয়ে পূর্ণরূপে তার সামনে আবির্ভূত হয়। তবে এটি যদি তার সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে থাকে তবে কিছুই মনে থাকে না।

এভাবে বেনামাযীর নিকট নামায একটি শাস্তি। অযথা সকালে উঠে শীতের মধ্যে ওযু করতে হয়। আরামের ঘুম পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়াদিকে ছেড়ে দিয়ে (নামায) পড়তে হয়।

মূলকথা হলো, সে অসন্তুষ্ট ও সে বুঝতে অক্ষম। নামাযের স্বাদ এবং তাতে যে শান্তি ও তৃপ্তি আছে সে সম্পর্কে সে অজ্ঞ। তাহলে নামাযে স্বাদ কীভাবে পাওয়া যেতে পারে? আমরা জানি একজন্য মদ্যপায়ী ও নেশায় আসক্ত ব্যক্তি যখন (নেশা করে) তৃপ্তি পায় না তখন সে গ্লাসের পর গ্লাস পান করতে থাকে এমনকি সে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বুদ্ধিমান ও আল্লাহ ভক্ত ব্যক্তি এ (উপমা) থেকে উপকৃত হতে পারে। আর তা হলো, সে ক্রমাগত নামায পড়বে এবং নিয়মিত পড়বে ও পড়তে থাকবে এমনকি সে (নামাযের) তৃপ্তি লাভ করে। যেভাবে একজন মদ্যপায়ীর মাথায় (নেশার) এক স্বাদ থাকে আর তা লাভ করা তার মূল উদ্দ্যেশ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মনমস্তিষ্ক এবং সকল শক্তিসামর্থ্যের প্রবণতা যদি নামাযে সেই আনন্দ লাভের প্রতি থাকে আর সেই স্বাদ লাভের জন্য যদি এক বিশেষ নিষ্ঠা ও উদ্দিপনা নিয়ে কমপক্ষে সেই মদ্যপ ব্যক্তির অস্থিরতা ও ব্যকুলতা ন্যায় (তার মাঝে) একটি দোয়া সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে আমি বলছি আর সত্যি সত্যি বলছি, সেই স্বাদ অবশ্য অবশ্যই লাভ হবে। এছাড়া নামায পড়ার সময় সেই কল্যাণ ও অনুগ্রহের প্রতিও গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত যা সে লাভ করে। إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (হুদ: ১১৫) । অর্থাৎ বিভিন্ন পুণ্যকর্ম পাপ পঙ্কিলতা দূর করে দেয়। অতএব এসব পুণ্য ও স্বাদের কথা মাথায় রেখে দোয়া করলে সিদ্দীক ও মুহসেনদের ন্যায় নামায পড়ার সামর্থ্য লাভ হয়।

এই যে বলা হয়েছে, إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ । অর্থাৎ বিভিন্ন পুণ্যকর্ম বা নামায পাপ পঙ্কিলতা দূর করে দেয় অথবা অনত্র বলেছেন, নামায অশ্লিলতা ও পাপ পঙ্কিলতা হতে রক্ষা করে। অপরদিকে আমরা দেখি, কিছু লোক নামায পড়ার পড়েও বিভিন্ন ধরনের পাপ করে, এর উত্তর হলো তারা নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু তা হয়ে থাকে প্রাণহীন ও অসাড়। তারা শুধু রীতিনীতি ও অভ্যাসবশত মাথা ঠোকায়। তাদের আত্মা মৃত। আল্লাহ্ তা'লা এগুলোর নাম হাসানাত বা পুণ্য রাখেন নি। এছাড়া এখানে যে হাসানাত শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং একই অর্থ হওয়া সত্ত্বেও আস সালাত শব্দ ব্যবহার করেন নি, এর কারণ হলো নামাযের বৈশিষ্ট্য এবং নানাবিধ সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা। কেননা যে নামায সততার চেতনা সম্বলিত এবং যাতে কল্যাণের প্রভাব নিহিত থাকে তা পাপ পঙ্কিলতা দূর করে।

সেই নামায শতভাগ নিশ্চিত ভাবে পাপ পঙ্কিলতা দূর করে। নামায শুধু উঠাবসার নাম না। নামাযের মূল ও প্রাণ হলো সেই দোয়া যা নিজের মাঝে একটি স্বাদ ও আনন্দ ধারণ করে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ; ১৬২-১৬৪)

অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, আমরা কি নামাযগুলোতে আনন্দ লাভ করি? আমরা তো কেবল উপকরণাদির ওপরই ভরসা করি না? আমরা যদি নামাযগুলোর সংরক্ষণকারী হয়ে থাকি তাহলে আমরা বয়আতের দাবি পূরণ করছি এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করছি। অন্যথায় আমাদের অবস্থা দুশ্চিন্তার বিষয়।

প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে আর মুর্শিদ ও মুরিদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মুর্শিদ ও মুরিদের সম্পর্কটি শিক্ষক ও ছাত্রের উদাহরণ থেকে বুঝে নেয়া উচিত। একজন ছাত্র যেভাবে শিক্ষকের কাছ থেকে উপকৃত হয় অনুরূপভাবে মুরিদও তার মুর্শিদের কাছ থেকে (উপকৃত হয়)। কিন্তু ছাত্র যদি শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক রাখার পরও নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি অগ্রসর না হয় তাহলে সে উপকৃত হতে পারে না। একই অবস্থা মুরিদেরও। অতএব এ জামা'তের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর নিজের তত্ত্বজ্ঞান ও শিক্ষার মান উন্নয়ন করা উচিত। সত্যান্বেষীকে একটি স্তরে উপনীত হয়েই থেমে যাওয়া উচিত নয়। অন্যথায় অভিশপ্ত শয়তান তাকে অন্য কাজে লাগিয়ে দিবে। যেভাবে বদ্ধ পানিতে কীটপতঙ্গা জন্ম নেয়, [অর্থাৎ থেমে থাকা পানিতে কীটপতঙ্গা জন্ম নেয় এবং তা বিভিন্ন রোগব্যাধীর কারণ হয়ে যায়] যারা এক স্থানে থেমে গেছে

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

এমন মানুষের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে থাকে। অতএব আমাদের পদক্ষেপ যেন সম্মুখ পানে অগ্রসরমান থাকে। তিনি (আ.) বলেন, একইভাবে মু'মিন যদি নিজের উন্নতি ও উন্নয়নের জন্য চেষ্টা না করে তবে সে অধঃপতিত হয়। সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য আবশ্যক সে যেন সত্যের সন্ধানে লেগে থাকে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর ন্যায় পরিপূর্ণ ও পূণাঙ্গীন আর কোনো মানুষই পৃথিবীতে জন্মে নি কিন্তু তাঁর জন্যেও رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا দোয়া করার শিক্ষা ছিল। তাহলে আর কে আছে যে নিজ তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ আস্থা রেখে থেমে যাবে এবং ভবিষ্যতে উন্নতির প্রয়োজন বোধ করবে না? মানুষ তার প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানে যত বেশি উন্নতি করবে সে তত বেশি বুঝতে পারবে, এখনো অনেক বিষয়ের সমাধান হওয়ার বাকি। কোনো কোনো বিষয় প্রাথমিক দৃষ্টিতে এমন শিশুর মত যে জ্যামিতিক চিত্রগুলোকে নিছক নিরর্থক বিষয় মনে করে। অর্থাৎ জ্যামিতিক বিভিন্ন চিত্র অথবা বিজ্ঞানীরা যেসব রেখাচিত্র অঙ্কন করে সেগুলোকে শিশু সাধারণ আকিবুকি মনে করে। তারা মনে করে এগুলোর কোনো মূল্য নেই। অতএব তিনি (আ.) বলেন, এমন মানুষ মূলত শিশুদের মতো। এসব বিষয়কে একদম নিরর্থক মনে করে। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু অবশেষে সেসব বিষয়ই বাস্তবরূপে তাদের চোখে ধরা দেয়। তারা যখন বড় হয় এবং বুদ্ধি হয় তখন বুঝতে পারে, এতে তো অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে। এজন্য নিজের অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলা আবশ্যক। তোমরা অনেক অযথা বিষয় পরিত্যাগ করে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছো। তিনি (আ.) বলেন, অনেক অনেক নিরর্থক বিষয় পরিত্যাগ করে এই জামা'ত গ্রহণ করেছো। তোমরা যদি এ বিষয়ে পূর্ণ ও গভীর জ্ঞান অর্জন না করো তাহলে এর দ্বারা তোমাদের কী লাভ হবে? তোমাদের বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে শক্তি কীভাবে সৃষ্টি হবে? সামান্য বিষয়ে তোমাদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হবে আর পরিশেষে পদস্খলনের আশঙ্কা রয়েছে। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৩)

অতএব জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি না করায় এবং মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কারণে কিছু মানুষের বিশ্বাস দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠ করে না।

আমরা যদি ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও আমরা উন্নতি করব এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের সত্যতার প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও আমরা অগ্রগামী হবো। নিজেদের সন্তানসন্ততির ঈমান সুরক্ষা করতে পারবে। এদিকেও অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন, আমার বয়আত করে থাকলে আমাকে (হাকাম) মীমাংসাকারী ও (আদল) ন্যায়বিচারক হিসেবে মান্য করো। এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রেখো, যে কথা আমি বলবো তা আল্লাহ্ ও মহানবী (সা.) -এর শিক্ষা অনুযায়ী বলবো। আল্লাহ তা'লার বিশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী বলবো। অতএব তিনি (আ.) বলেন, নিজ বিশ্বাসকে এমন স্তরে উপনীত করো যাতে (হাকাম) মীমাংসাকারী ও (আদলের) ন্যায়বিচারকের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে পারো।

তিনি (আ.) বলেন, " যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করে তার উচিত ঈমানের পর্যায় থেকে দৃঢ় বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নতি করা। কেবল অনুমানের বশবর্তি যেন না হয়। স্মরণ রেখো, অনুমান কল্যাণকর হতে পারে না। এতে কুধারণা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেন, إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا অর্থাৎ নিশ্চয় অনুমান কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না (সূরা ইউনুস: ৩৭)। সত্য সত্যই হয়ে থাকে। কুধারণা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সত্যকে গোপন করা যায় না। দৃঢ় বিশ্বাসই একমাত্র জিনিস যা মানুষকে সফল করতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কিছুই হয় না। মানুষ যদি সকল বিষয়ে কুধারণা পোষণ করতে শুরু করে তাহলে পৃথিবীতে সে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারবে না। সব জাগতিক বিষয়েই যখন তুমি কুধারণা পোষণ করতে শুরু করেছো তখন সেখান থেকেই দৃষ্টান্ত দেখে নাও। সম্ভবত বিষ মেশানো আছে- এ সন্দেহে সে পানি পান করতে পারবে না। বিধ্বংসী কোনো উপদানের ভয়ে সে বাজারের কোনো জিনিস খেতে পারবে না। তাহলে সে কীভাবে বাঁচবে। এটি মোটা উদাহরণ। যার সন্দেহ করার রোগ হয় সে দুশ্চিন্তা করতে করতে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। আধ্যাত্মিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও সচেতন থাকা উচিত যেন এমন কুধারণা সৃষ্টি না হয়।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

তিনি (আ.) বলেন, এভাবে মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয়েও কল্যাণ লাভ করতে পারে। এখন তোমরা নিজেরাই দেখো এবং নিজ হৃদয় মাঝেই সিদ্ধান্ত নাও যে, তোমরা যে আমার হাতে বয়আত নেওয়ার পর আর আমাকে মসীহ্ মওউদ এবং (হাকাম) মীমাংসাকারী ও (আদাল) ন্যায়বিচারক হিসেবে মান্য করার পর যদি আমার কোনো সিদ্ধান্ত বা কাজে তোমাদের হৃদয়ে কোনো ধরনের খেদ ও ক্লেশের সৃষ্টি হয় তাহলে তোমাদের ঈমানের বিষয়ে চিন্তিত হও। যে ঈমান সন্দেহ ও সংশয়ে পরিপূর্ণ তা কোনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না। কিন্তু তোমরা যদি সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে মান্য করে থাকো যে, সত্যিকার অর্থেই মসীহ্ মওউদ (আ.) হাকাম (মীমাংসাকারী) তাহলে তার নির্দেশ ও কর্মের সামনে নিজের সকল অস্ত্র সমর্পণ করো এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখো যাতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কথার সম্মান ও মর্যাদা প্রদানকারী সাব্যস্ত হতে পারো। মহানবী (সা.)-এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি (সা.) আশ্বস্ত করে বলেছেন, তিনি তোমাদের ইমাম হবেন, হাকাম (মীমাংশাকারী) ও আদল (ন্যায়বিচরক) হবেন। এতেও আশ্বস্ত না হলে আর কখন হবে? এ পন্থা মোটেও ভালো নয় আর (কখনো) কল্যাণকর হতে পারে না যে, ঈমানও থাকবে আর হৃদয়ের কোনো এক কোণে কুধারণাও (সুপ্ত) থাকবে। আমি যদি সত্যবাদী না হই তাহলে যাও অন্য কোনো সত্যবাদীর সন্ধান করো আর নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, এ সময় অন্য কোনো সত্যবাদী পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যদি তোমরা অন্য কোনো সত্যবাদী না পাও আর মোটেও পাবে না তাহলে তো আমি ততটুকু অধিকার রাখি যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে দিয়েছেন।

যারা আমাকে অস্বীকার করেছে আর যারা আমার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছে তারা আমাকে সনাক্ত করতে পারে নি। এছাড়া যারা আমাকে মেনে নেওয়ার পর আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করে তারা আরো বেশি দুর্ভাগা, কেননা তারা চোখ থাকতেও অন্ধ। মোটকথা সমসাময়িক যুগও সম্মানহানী ঘটায়।

এজন্যই হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, নবী নিজ দেশ ছাড়া অন্য কোথাও অসম্মানিত হন না। এথেকেই বুঝা যায় তাঁকে স্বদেশীদের দ্বারা কী কী দুঃখ ও কষ্ট সহ্য হয়েছে। এটি নবীগণের সাথে এক সুন্নতরূপে চলে আসছে, আমি এথেকে কীভাবে আলাদা পেতে পারি?"

নবীগণের বিরোধিতা তো সকল যুগেই হয়ে আসছে, এখন আমার সাথে হলেও তা কোনো নতুন বিষয় নয়। এজন্য আমাদের বিরোধীদের পক্ষ থেকে আমাদের যা শুনতে হচ্ছে তা সেই সুন্নতেরই অংশ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ অর্থাৎ তাদের নিকট যখনই কোনো রসূল এসেছে তারা তার সাথে হাসি-বিদ্রুপ করেছে। (সূরা হিজর, আয়াত: ১২) হায় পরিতাপ! এসব লোক যদি স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে আমার নিকট আসতো তাহলে আমি তাদেরকে তা দেখাতাম যা খোদা তা'লা আমাকে দান করেছেন। সেই খোদা নিজে তাদের স্বীয় অনুগ্রহ করতেন এবং তাদেরকে (সত্য) বুঝিয়ে দিতেন কিন্তু তারা কার্পণ্য ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করেছে। এখন আমি তাদেরকে কীভাবে বোঝাব?"

এখন প্রায় ১৩২ বৎসর হতে চলেছে তারপরও এসব লোক বিভিন্ন নিদর্শন দেখেও শিক্ষা গ্রহণ করে না। তিনি (আ.) বলেন, "মানুষ যখন স্বচ্ছ হৃদয়ে সত্যের সন্ধানের জন্য আসে তখন সব সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু কারো উদ্দেশ্য যদি অপালাপ ও দুষ্টুমি হয় তাহলে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। 'হিজাজুল কিরামা' পুস্তকে ইবনে আরাবী (রাহে.) উদ্ধৃতি মূলে লিখা হয়েছেন, 'মসীহ্ মওউদ যখন আগমন করবেন তখন তাঁকে মিথ্যাবাদী ও অজ্ঞ হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে, এমনকি তার সম্পর্কে এটিও বলা হবে যে, তিনি ধর্মকে পরিবর্তন করছে। এখনও এমনটি হচ্ছে, আমার ওপরও এ ধরণের আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে। এসব সন্দেহ থেকে মানুষ তখনই মুক্তি পেতে পারে যখন সে তার ইজতেহাদের, অর্থাৎ যুক্তিতর্কের পুস্তক বন্ধ করে নিবে আর এর পরিবর্তে তারা এটি চিন্তা করবে যে, এই ব্যক্তি কি সত্যবাদী নাকি না? নিঃসন্দেহে কিছু বিষয় চিন্তাভাবনার উর্ধ্বে হয়ে থাকে কিন্তু নবীদের প্রতি যারা ঈমান আনে তারা সুধারণা, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এক সময়ের অপেক্ষায় থাকে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্মুখে প্রকৃত সত্য উন্মোচন করেন। মহানবী (সা.)-এর যুগে সাহাবীরা প্রশ্ন করতেন না বরং তারা অপেক্ষায় থাকতেন আর কেউ এসে প্রশ্ন করলে তা থেকে তারা থেকে উপকৃত হতেন। না হলে তারা আদবের সাথে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকতেন আর প্রশ্ন করার দুঃসাহস দেখাতেন না। আমার নিকট প্রকৃত ও স্বীকৃত পন্থা হলো আদব প্রদর্শন করা। যে ব্যক্তি নবীর আদবকে বুঝে না আর তা অবলম্বন করে না তার সম্বন্ধে শঙ্কা হয়, তাকে না আবার ধ্বংস করে দেওয়া হয়।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৩-৭৫)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এগুলো তাঁর যুগের কথা বলছেন যখন এ ধরনের লোক তাঁর (আ.) -এর সভায় বসতো, বর্তমানে এ ধরণের লোক তাঁর পুস্তকাদি পাঠ করে এবং তাঁর দলিল-প্রমাণ শুনেও এ ধরনের কথা

বলে। তিনি (আ.) বলেন, এ ধরনের লোকেরা নবীর আদব বুঝে না আর তাদের সম্বন্ধে শঙ্কা হয়, তারা ধ্বংস না হয়ে যায়!

মুসলমানরা তাদের দুর্ভাগ্যের কারণে এই বাণী শুনতে ও অনুধাবন করতে অনেক অজুহাত ও বাহানা প্রদর্শন করে আর তাদের দুর্দশাও তাদেরকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না যে, জাতিগতভাবে আমাদের এরূপ দুর্দশার কী কারণ তা একটু খতিয়ে দেখবে। সেই যুগও এসে গেছে আর মহানবী (সা.) -এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হচ্ছে। অতএব কমপক্ষে সেই প্রতিশ্রুত আগমনকারীর অনুসন্ধান তো করো। তিনি (আ.) বলেন, আমি না হলেও অন্য কেউ তো আসবে! কিন্তু তোমরা আর কাউকেই পাবে না। কিন্তু তোমরা আর কাউকে খুঁজে পাবে না। জাগতিকতায় মত্ত হয়ে সবকিছু ভুলে যাচ্ছে কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করা আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী প্রত্যেকের কাছে পোঁছে দেয়া আমাদের কাজ আর কেবল মুসলমাদের মাঝেই নয় বরং প্রত্যেকটি মানুষের কাছে তাই সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন অথবা বিধর্মী হলেও তাদের কাছে এই বাণী পোঁছে দিতে হবে।

আমাদের এখনো অনেক কাজ করতে হবে। জার্মানী জামা'তের শত বছর পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা সকল জার্মানের কাছে ইসলামের বাণী পোঁছাতে পারি নি। অতএব এ দিক দিয়েও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

ইসলামের বাণী পোঁছাতে এবং তবলীগের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন:

"এ মুহূর্তে আমাদের দুটি বড় প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে। প্রথমত আরবে প্রচার -প্রসার এবং দ্বিতীয়ত ইউরোপের ওপর যুক্তি-প্রমাণ সম্পন্ন করা। আরবের ওপর কেননা তারা অভ্যন্তরীণভাবে অধিকার রাখে। অনেক বড় অংশ এমন হবে যে, যারা জানবেও না যে, খোদা তা'লা কোনো জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

আজও এটি সত্য যে, আরবের সব লোকের কাছে আমাদের বাণী পোঁছে নি যদিও পূর্বের তুলনা অনেক বেশি চেষ্টা -প্রচেষ্টা চলছে। যদিও কিছুটা প্রচার হয়েছে তবুও তা বিরোধিদের মাধ্যমে যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর নামের সাথে ঠাট্টা করে আমাদেরকে কাদিয়ানী বলে ডেকে আমাদেরকে জগতে এবং নিজেদের লোকদের মাঝে পরিচিত করেছে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যাপারে প্রত্যেক প্রকার মিথ্যা ও মনগড়া গল্প লোকদেরকে শোনায়। এভাবে এক পক্ষীয় বাণী তাদের কাছে পোঁছেছে। যদি কিছুটা পরিচিতি হয়েই থাকে তবে তা হয়েছে বিরোধীদের দ্বারা কিন্তু আমাদের মাধ্যমে ভালোভাবে পরিচিতি হয় নি।

যাহোক, তিনি (আ.) বলেন: "এটি আমাদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব যে, তাদের কাছে (ইসলামের বাণী) পোঁছাতে হবে আর না পোঁছালে পাপ হবে।এমনিভাবে ইউরোপবাসীরা এই অধিকার রাখে যে, তাদের ভুলগুলো যেন প্রকাশ করা হয় যে, তারা এক বান্দাকে খোদা বানিয়ে খোদা থেকে দূরে ছিটকে গেছে। ইউরোপের তো এই অবস্থা হয়ে গেছে যে, সত্যিই "আখলাদা ইলাল আরদ" এর সত্যায়ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা মাটির দিকে পতিত হয়েছে। জাগতিকতা ছাড়া তাদের লোকেরা আর কোনো কিছুর পরোয়া করে না। আমাদের কতক লোক এবং যুবকেরা তাদের এই উন্নতিতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে- এ কথা বলার পরিবর্তে যে, তোমরা যে দিকে অগ্রসর হচ্ছো তা কেবল ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রভাবিত হওয়ার আবশ্যকতা নেই। আমাদের তবলীগ করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার উদ্ভাবন হচ্ছে পশ্চিমা দেশ এবং উন্নত দেশে। এগুলো দেখে চোখ বিষ্ফারিত করো না যে, ইউরোপ জাগতিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নতি করছে। এটি নীতির কথা যে, যখন ঐশী জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়তখন জাগতিক বিষয়াদীই মাথায় আসে। একথা প্রমাণসিদ্ধ নয় যে, নবীরাও কলকব্জা বানাতেন, যন্ত্রাংশ বানাতেন অথবা তাদের সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং মনোযোগ জাগতিক আবিষ্কারের দিকে হতো।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৩-২৫৪)

অতএব এ বিষয়টি আমাদের প্রত্যেকের মাথায় ঢুকে যাওয়া উচিত যে, আমরা জগৎ কামানোর উদ্দেশ্যে আহমদীয়াত গ্রহণ করি নি বরং খোদা তা'লার সাথে জীবিত সম্পর্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি আর এই বাণী আমাদেরকে জগদ্বাসীদের মাঝে পোঁছে দিতে হবে। এ বিষয়ই আমাদের ইহকাল ও পরকালের পথ সুগম করবে।

তিনি (আ.) নিজ আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমার আগমনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আমি যেন তৌহিদ (তথা একত্ববাদ), আখলাক (চারিত্রিক গুণাবলী) এবং রূহানিয়্যত (তথা আধ্যাত্মিকতা) বিস্তার করি। তৌহিদ দ্বারা বুঝায় খোদা তালাকেই যেন নিজের মাতলুব, মাকসুদ ও মাহবুব এবং মাতা' (সকল চাওয়-পাওয়ার লক্ষ্যস্থল, উদ্দেশ্য, প্রিয় ও অনুসরণীয়) বিশ্বাস করা হয়। বড় বড় মুর্তিপূজা এবং শিরক থেকে শুরু করে বস্তু পুজার শিরক, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরক এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করা - এ ধরনের বিষয়গুলো দূর করা। প্রত্যেক বিষয়ে নিজ আমিত্বের শিরক যেন না থাকে। কোনো সূক্ষ্ম শিরক যেন অন্তর্ভুক্ত না থাকে সেটিই হল তৌহিদ। যে বিষয়ে আজকাল জগত মত্ত হয়ে গেছে তা থেকে বেঁচে চলা আর আখলাক বা চারিত্রিক আদর্শ বলতে বুঝায় যেরূপ শক্তি নিয়ে মানুষ এসেছে তা পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যয় করা। এমনটি নয় যে কতক শক্তি সম্পূর্ণরূপে বৃথা ফেলে রাখা আর কতক শক্তির ওপর অতিমাত্রায় জোড় প্রদান করা। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ তার হাতকে সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলে তবে কি এর মাধ্যমে কোন প্রকার উত্তম পরিণাম সৃষ্টি হতে পারে? কখনো নয়, বরং প্রকৃত ও পরিপূর্ণ চারিত্রিক আদর্শ হল এটিই যে, যে শক্তি আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে রেখেছেন তা পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী এমনভাবে ব্যয় করা যাতে বাড়াবাড়ি না হয়। আফরাত তথা আধিক্য হল এটি যে, যার ঘ্রাণ শক্তি প্রখর হয়ে থাকে তার মধ্যে তীক্ষ্ম ইন্দ্রিয় শক্তির ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ ঘ্রাণ শক্তি যদি প্রখর হয়ে যায় তাহলে এটি সেই মানুষের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কতক লোকের ঘ্রাণ শক্তি প্রখর হয়ে যায় যার ফলে তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, মাথাব্যাথা শুরু হয়ে যায়। অন্যান্য আরো কিছু গন্ধ আছে যার ফলে রোগ সৃষ্টি হয়। তাই এই দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখেন এবং সকল প্রকারের ব্যাধি থেকে যেন রক্ষা করেন, আধ্যাত্মিক ব্যাধি থেকেও। সুতরাং আফরাত হল প্রখর অনুভূতি শক্তির ব্যাধি সৃষ্টি হওয়া এবং এর মাধ্যমে আরো কঠিন ব্যাধির সৃষ্টি হওয়া।

তিনি (আ.) বলেন, তাফরীত হল তার ইন্দ্রীয় শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলোপ পায় এবং ই'তেদাল তথা মধ্যমপন্থা বা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা হলো উভয়েই স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান থাকবে। আর এটিই হল সেই অবস্থা যখন আখলাক সঠিক অর্থেই আখলাক হিসেবে পরিগণিত হয় আর এটি-ই প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আবির্ভূত হয়েছি।"

মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী যার নির্দেশ ইসলাম প্রদান করেছে, তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন, "আধ্যাত্মিকতা বলতে সেই প্রভাব ও লক্ষণকে বুঝায় যা খোদা তা'লার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয় আর এই অবস্থা যতক্ষণ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অনুধাবন করতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৭)

অতএব এগুলো হল সেসব বিষয় যা আমাদেরকে এমন এক মানুষে পরিণত করে যাকে প্রকৃত মুমিন বলে। সুতরাং এই আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমরা কি এই মানদণ্ডের ওপর অধিষ্ঠিত যে, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা এবং একমাত্র প্রেমাস্পদ হচ্ছে খোদা তা'লার সত্তা? যদি এমনটি না হয়ে থাকে তবে আমরা এখনো দূর্বল ঈমানের পর্যায়ে রয়েছি।

অতএব আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। খোদা তা'লার বিপরীতে আমাদের সকল পার্থিব কামনা-বাসনা বৃথা নাকি নয়-এর প্রয়োজন রয়েছে। যদি এমনটি হয় তবেই আমরা মসজিদের প্রকৃত হক আদায়কারী সাব্যস্ত হব। তদ্রুপ যখন আমরা মসজিদ নির্মাণ করছি তখন তা আবাদ করার জন্যও চিন্তা থাকতে হবে।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এই বিষয়ের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করা উচিত যে, তার হৃদয়ে তওহীদ তথা একত্ববাদের প্রতি কতটুকু আবেগ, স্পৃহা, প্রেরণা রয়েছে। তদ্রুপ প্রত্যেক আহমদীর মাধ্যমে উন্নত চারত্রিক আদর্শের বর্হিপ্র কাশ হওয়া আবশ্যক। এই উন্নত চারত্রিক আদর্শই আমাদের বাণী পোঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়াতের অধিকার আদায় করতে পারি। বিভিন্ন মসজিদ উদ্বোধনের সময় যখন আমি যাই তখন আহমদীদের সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিবর্গ একথা বলে থাকেন যে, আহমদীদের আখলাক ভালো; কিন্তু একটি দূর্বলতা আমি লক্ষ্য করেছি আর তা হলো, এরা ভালো চারিত্রিক আদর্শ প্রদর্শন করে ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রকৃত পরিচয় সঠিক অর্থে উপস্থাপন করে না। যদি এই পরিচিতি করানো যায় তবেই যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আহমদীয়াত ও ইসলামের সঠিক বাণী ইউরোপবাসীদের নিকট, এই দেশের মানুষের নিকট পোঁছাতে পারব।

তদ্রুপ উন্নত চারত্রিক আদর্শের বর্হিপ্রকাশ পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও হওয়া উচিত। কেবলমাত্র অন্যদের ক্ষেত্রেই যেন না হয়। তাদেরকে তো উন্নত চারিত্রিক আদর্শ প্রদর্শন করেছি কিন্তু ঘরে ও নিজ সমাজে নৈরাজ্য বিরাজ করে। অতএব চারিত্রিক আদর্শ সংক্রান্ত এ বিষয়গুলো আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এই উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। অত:পর তিনি (আ.) বলেন, আধ্যাত্মিকতার উচ্চমানের ফল তখন প্রতিষ্ঠিত ও

প্রকাশিত হয়, তখন এটি বোঝা যায় যে আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি হয়েছে যখন আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার আদায়ের উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজেদের লোকেরা ও বাইরের লোকেরা আমাদের ভেতর একটি অনুপম সৌন্দর্য দেখতে পাবে। আমাদের শিশুরা আমাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। তখনই আমরা বলতে পারব যে আমরা সেই মান অর্জন করেছি।

জার্মানীর আমীর সাহেব আমাকে গত কয়েকদিন ধরে জিজ্ঞেস করছেন আমাদের আগামী শতাব্দীর লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? প্রথম কথা হচ্ছে, আমি যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করেছি এগুলোই সব কথা নয়। কিছু বিষয় রয়েছে যেদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সেগুলো কি আমরা বিগত শতাব্দীতে অর্জন করেছি? আমাদের কি খোদা তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আমাদের নামাযের কি উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আমরা কি নামাযের সময়গুলোতে পার্থিব কাজকর্ম ছেড়ে নামাযের জন্য উপস্থিত হয়ে যাই নাকি শুধু মসজিদ বানানোকেই প্রাধান্য দিই? আমরা কি কুরআন করীম নিয়মিত পাঠ করি? আমরা কি কুরআনের আদেশাবলী অনুসন্ধান করে সেগুলো পালনের চেষ্টা করি? আমরা কি আমাদের সন্তানদের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করছি? আমরা কি সন্তানদের শুধু জাগতিক শিক্ষার কথা ভাবি নাকি ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিও দৃষ্টি আছে? পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের চরিত্র কি সেই উন্নত মান অর্জন করেছে যা আমাদেরকে "রুহামাউ বাইনাহুম" এর দৃশ্য দেখাবে? অন্যদের প্রতি উন্নত নৈতিকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তাদেরকে কি আমরা ইসলামের অনুপম শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করছি, নাকি শুধু উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করে এটি বলছি যে আমরা শান্তিপূর্ণ লোক?

অনেক স্থানে যখন আমি অন্যদেরকে কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি তখন অধিকাংশ লোক এটিই বলেছে যে আমরা ইসলামের এ অনিন্দ্য শিক্ষা সম্পর্কে এই প্রথম জানতে পেরেছি। এতে সুস্পষ্ট হয় যে আপনারা আপনাদের সম্পর্ক ও নৈতিকতাকে ইসলামের বাণী পৌছানোর জন্য সেভাবে ব্যবহার করছেন না যেভাবে করা প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ সংখ্যক প্যামফ্লেট বিতরন করে কী লাভ যদি সেটির মাধ্যমে লোকেরা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কেই জানতে না পারে।

সুতরাং প্রথমে এটি যাচাই করুন, আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার আদায়ের কতটুকু উন্নত মান আমরা অর্জন করেছি। যদি অর্জন করে থাকি, যদিও আমার দৃষ্টিতে এখনো অর্জিত হয় নি, আমার বলার প্রয়োজন নেই প্রত্যেকে নিজের আত্মবিশ্লেষন করলেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন, তাহলে আগামী শতাব্দীর নতুন লক্ষ্য কী?

আগামী শতাব্দীর লক্ষ্য হলো এসব সংক্ষিপ্ত কর্ম -পরিকল্পনা যা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে বর্ননা করেছি। আমরা এ দাবী নিয়ে দাড়িয়েছি যে আমাদেরকে পৃথিবীবাসীর হৃদয় জয় করতে হবে। পৃথিবীবাসীকে খোদা তা'লার একত্বে বিশ্বাসী বানাতে হবে। পৃথিবীবাসীকে মহানবী (সা.)-এর পদতলে সমবেত করতে হবে। সুতরাং এই দিক থেকে আমাদের প্রত্যেককে নিজের আত্মপর্যালোচনা করতে হবে এবং একটি নতুন সংকল্পের সাথে আহমদীয়া জামা'ত জার্মানীকে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করতে হবে অর্থাৎ আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের এ উদ্দেশ্যকে অর্জনের পূর্ণ চেষ্টা করব এবং নিজ সন্তানদের ও বংশধরদেরও এ উপদেশ দিতে থাকব এবং তাদের এমনভাবে তরবিয়ত করব যেন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের এ জাগরন এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন। আমীন

****

বিয়ের সময় গয়না ও বস্ত্রের দাবি করা

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

"আমি এ বিষয়ের প্রতি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, প্রথা একটি মন্দ বিষয়, তা যে কোন প্রকারের হোক না। আমার পরিতাপ হয় যে, আমাদের জামাতের লোকেরা কিছু প্রথা উদযাপন করেছে তবে ভিন্ন রূপে অনেকে সেটাকেও গ্রহণ করে নিয়েছে। পূর্বে নিকাহর সময় বাড়িতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হত যে কি পরিমাণ গয়না ও বস্ত্র নেওয়া হবে। কালক্রমে সেটা লিখিত শর্তাকারে আসতে শুরু করল। এরপর আমার সামনেও সেটা আসতে শুরু করল। শরিয়ত কেবল মোহর নির্ধারণ করেছে, এছাড়া ছেলেদের পক্ষ থেকে গয়না ও বস্ত্রের দাবি করা নির্লজ্জতা। এটাকে মেয়ে বিক্রি করা বলা ছাড়া অন্য কিছু আমার মাথায় আসছে না।.... আমি ভবিষ্যতের জন্য ঘোষণা করছি যে, যদি আমি জানতে পারি যে, কোন নিকাহর জন্য বস্ত্র বা গয়নার শর্ত রাখা হয়েছে বা কন্যাপক্ষ এমন দাবিও জানিয়েছে, তবে আমি এমন নিকাহর ঘোষণা করব না।"

(খুতবা নিকাহ, প্রদত্ত-২৭ শে মার্চ, ১৯৩১)

(রিশতানাতা বিভাগ, নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

ধর্মযুদ্ধ করে না। তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের এই জন্য কর্তব্য যে, আমরা আমাদের কর্মে মক্কা এবং মদীনায়ও করিতে পারিতাম না। কিন্তু তাহাদের রাজ্যে তাহা করিতে পারিতেছি, খোদাতালার পক্ষ হইতে ইহা এক হিকমত (গভীর প্রজ্ঞা) ছিল যে, আমাকে তিনি এই দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আমি কি খোদার হিকমতের অমর্যাদা করিব?

..... খোদাতালা আমাকে এই গভর্নমেন্টরূপে উচ্চ মালভূমিতে স্থান দান করিয়াছেন যেখানে শত্রুর হস্ত পৌঁছিতে পারে না, যেস্থান আরামদায়ক। এই দেশে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস প্রবাহিত হইতেছে এবং উপদ্রবকারীদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। অতএব এরূপ গভর্নমেন্টের উপকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কি আমাদের কর্তব্য ছিল না? "

(কিশতিয়ে নূহ রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃ: ৭৫)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমি মিথ্যা দ্বারা এই সরকারকে প্রীত করতে চাই না। যদি এমনটা হত তবে আমি তাদের খোদা যীশুকে কেন মৃত আখ্যায়িত করতাম। স্বভাবতই এতে তাদের কষ্টই বাড়বে। তাই আমি যা কিছু বলেছি সত্য প্রকাশের জন্য এবং ইসলামের শিক্ষানুসারে বলেছি।" এই ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর অবস্থান, কিন্তু যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর আপত্তি তোলে যে, যেহেতু তিনি ইংরেজদের প্রশংসা করেছেন, তাই এর থেকে ইংরেজদের চর হওয়া প্রমাণিত। এখন আল্লামা ইকবাল এর কথা শুনুন। সেই যুগে তিনি ইংরেজদের সম্পর্কে বলতেন এবং লিখতেন, তাঁর চিন্তাধারা এবং আবেগ অনুভূতি কিরূপ ছিল তা পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হল। রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে তিনি এক শোকবার্তা মূলক কবিতা লেখেন যার ভাবার্থ নিম্নরূপঃ

যে মাসে রাণি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়, সেই মাসটির নাম যা-ই বল না কেন, বস্তুত এটি মহরমের ঘটনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। মহরমের যে যন্ত্রনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল, এই ঘটনাটি তার এক নতুন রূপ। তিনি আরও বলেন-

লোকে বলে আজকে ঈদ হয়েছে, হতে পারে।
এমন ঈদের চেয়ে মৃত্যু আসাই ভাল, খোদা করুক।
এরপর লেখেন-
হে হিন্দ! তোমার মাথা থেকে খোদার ছায়া সরে গেছে।
তোমার বাসিন্দাদের দুঃখ লাঘবকারী একজন ছিল, যে গত হয়েছে।
যার দ্বারা আরশ প্রকম্পিত হয়, এটাই সেই ক্রন্দন ধ্বনি।
যার মাধ্যমে তোমার সৌন্দর্য ছিল, আজ তারই জানাযা।

(বাকিয়াত ইকবাল, সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ মাঈনী, পৃ: ৭৩,৭৬,৮১,৯০)

'মুনসিফ' পত্রিকার সম্পাদক পড়ে দেখুন যে, আল্লামা ইকবাল রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশংসাই করেন নি,বরং তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এমনকি তাঁকে খোদার ছায়া নামে অভিহিত করেছেন। আহলে হাদীসের বিদগ্ধ আলেম ও বুর্যুগ শামসুল উলেমা মৌলানা নাযির আহমদ দেহেলবী বলেন: "সমগ্র হিন্দুস্তানের মঙ্গল এতে নিহিত যে, কোন আগন্তুক শাসক আমাদের শাসক হোক, যে না হবে হিন্দু না মুসলমান, সে ইউরোপের কোন সম্রাট হোক (ইংরেজ বলে নয়, যে কেউ হোক, কিন্তু ইউরোপের হোক) কিন্তু খোদার অশেষ করুণা ,,,, হয়েছে যে, ইংরেজ সম্রাটের আগমণ ঘটেছে।"

(মাজমুয়ায়ে লেকচার, মৌলানা নাযির আহমদ দেহেলবী, পৃ: ৪, ৫)

তিনি আরও বলেন, 'সরকার কি অত্যাচারী ও কঠোর। তওবা তওবা, তারা তো পিতামাতার চাইতেও স্নেহশীল।

তিনি আরও বলেন:

"আমি যতদূর জানি, এই মুহূর্তে হিন্দুস্তানের বাইরে দেশগুলোতে দৃষ্টিপাত করছিলাম। বর্মা, নেপাল, আফগানিস্তান, এমনকি পারস্য, মিশর ও আরব দেশসমূহ পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে এমাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত নিজের চিন্তাকে ছুটিয়েছি। কিন্তু বুঝে উঠতে পারি নি যে, যাকে আমি হিন্দুস্তানের বাদশাহ বানাব (অর্থাৎ নিজের কল্পনায় যদি আমি কাউকে বাদশা বানাতাম, তবে কাকে বানাতাম?) প্রত্যাশী সম্রাটদের মধ্যে থেকে আর কোনও দল এই মুহূর্তে ছিল না, যাকে আমি এর যোগ্য বলে মনে করতে পারতাম। অতএব, এই মুহূর্তে আমার সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, ইংরেজরাই হিন্দুস্তানকে শাসক হওয়ার যোগ্য, তাদের হাতে এটা বহাল থাকা উচিত।"

(মাজমুয়ায়ে লেকচার, মৌলানা নাযির আহমদ দেহেলবী, পৃ: ২৬)

মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী ইংরেজ সরকার সম্পর্কে মনে করতেন-

"রোমের সম্রাট একজন ইসলামী শাসক ছিলেন। কিন্তু সার্বিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সুশাসনের বিচারে (ধর্ম নির্বিশেষে) ব্রিটিশ সরকারও আমরা মুসলমানদের গর্ব হিসেবে কোন অংশে কম নয়। আর বিশেষ করে আহলে হাদীসের মত সম্প্রদায়ের জন্য এই সরকার শান্তি ও স্বাধীনতার দিক থেকে সমসাময়িক সকল ইসলামী শাসন ব্যবস্থা (রোম, ইরান, খুরাসান) এর চায়তে বেশি গর্বের।

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০১৩

ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর বিশেষ অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন: মহিলাদের নিজেদের মুখে বা চেহারায় প্ল্যাকিং এবং থ্রেডিং ইত্যাদি করার এবং দেহের বিভিন্ন অংশে ছবি বা ট্যাটু আঁকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: বিভিন্ন হাদীসে মহিলাদেরকে তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে ছবি বা ট্যাটু আঁকার, মুখের চুল উপড়ে ফেলার, সৌন্দর্য বর্ধন এবং তারুণ্য প্রদর্শনের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা, পরচুলা ব্যবহার করা আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয়ে বারণ করা হয়েছে। এর বিভিন্ন কারণ বা উদ্দেশ্য রয়েছে।

যদি এসব কারণে মানুষের শারীরিক অবস্থার মধ্যে কোনো কৃত্রিম পরিবর্তন সাধিত হয় অর্থাৎ নারী-পুরুষের মধ্যে খোদা তা'লা যে (দৈহিক) তারতম্য রেখেছেন তা শেষ হয়ে যায় অথবা এমন কর্মের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় পাপ শিরকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে (এসব কাজ করতে) বারণ করা হয়েছে। এরপর হাদীস শরীফে যেখানে এসব বিষয় সম্পর্কে বারণ করা হয়েছে সেখানে মহানবী (সা.) এই সতর্কবার্তাও দিয়েছেন যে, বনী ইসরাঈলীরা তখন ধ্বংস হয়েছিল যখন তাদের নারীরা এধরনের কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। অতএব এথেকে প্রমাণ হতে পারে যে, ইহুদী- যাদের সমাজে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অশ্লীলতার আড্ডাখানা গড়ে উঠেছিল, আর এই (পাপ) কাজে জড়িত মহিলারা, পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য হাতের কৌশল বা প্রতারণার আশ্রয় নিত। এজন্যই মহানবী (সা.) এসব কাজের নোংরামী বর্ণনা করে, মু'মিন নারীদেরকে এথেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

এছাড়া এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশনা সে সময়ের অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে সাময়িক ছিল। ঠিক সেভাবে যেভাবে মহানবী (সা.) এক অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণকারী লোকদেরকে সেই অঞ্চলে মদ প্রস্তুতকরার জন্য ব্যবহৃত বাসন কোসনের সার্বজনীন ব্যবহারে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা যখন খুব ভালভাবে ইসলামী শিক্ষায় অভ্যস্ত হয় তখন পুনরায় হুযূর (সা.) তাদেরকে এসব বাসনকোসনের সার্বজনীন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন।

ইসলাম কর্মের ভিত্তি রেখেছে নিয়্যত বা সংকল্পের ওপর। কাজেই, এ যুগেও যদি এসব কর্মকাণ্ডের ফলে কোনোরূপ মন্দের প্রতি আকর্ষণ জন্মে অথবা ইসলামের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘিত হয় তাহলে এই কাজ মহানবী (সা.)-এর সেই সতর্কবার্তার অধীনেই গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, এযুগেও যদি মহিলারা তাদের পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা অথবা ওয়াক্সিং ইত্যাদি করার সময় পর্দার প্রতি (যথাযথভাবে) খেয়াল না রাখে এবং অন্যান্য মহিলার সামনে তাদের দেহ অনাবৃত হয় তাহলে এটি নির্লজ্জতা, যার অনুমতি নেই। আর সম্ভবত এমন মহিলারা [মহানবী (সা.)-এর] সেই সতর্কবার্তার অধীনে আসবে। কিন্তু পর্দা সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা (যথাযথভাবে) পালনের মাধ্যমে যদি কোনো মহিলা এসব বিষয় থেকে উপকৃত হতে চায় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জানতে চেয়েছেন যে, এক সফরে একাধিক উমরাহ্ করা উত্তম নাকি একটি উমরাহ্ করার পর বাকি সময় অন্যান্য ইবাদতে রত থাকা উচিত?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের আলোকে এটি সাব্যস্ত যে, হুযূর (সা.) এক সফরে একবারই উমরাহ্ করেছেন। কিন্তু হুযূর (সা.) কোথাও এটি বারণ করেন নি যে, এক সফরে একাধিকবার উমরাহ্ করতে পারবে না। তাই কেউ যদি মহানবী (সা.)-এর সুন্নত মোতাবেক এক সফরে কেবল একবারই উমরাহ্ করে এবং অবশিষ্ট সময় অন্যান্য ইবাদতে অতিবাহিত করে তাহলে এটিও ঠিক আছে আর সে যদি একাধিক উমরাহ্ করতে চায় তাহলে উমরাহ্‌র সময়ও যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার গৃহ প্রদক্ষিণ করা হয়, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা বা দৌড়ানো হয়, বিভিন্ন যিকির-আযকার এবং নফল ইত্যাদি পড়া হয় তাই এতেও কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা বিধবাদের ইদ্দতকালীন সময়ে লাজনাদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করার, বাজামা'ত নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসার এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার বিষয় সম্পর্কিত মাসলা কী তা জানতে চেয়েছেন। এছাড়া (তিনি)আরও লিখেছেন যে, বয়স্ক মহিলাদের জন্য ইদ্দতের বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের পত্রে এসব বিষয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: বিধবার ইদ্দত পালন সম্পর্কিত বিধিবিধান পরিবর্তনের অনুকূলে আপনি আপনার পত্রে তালাকের পর (পুনরায়) প্রাক্তন স্বামীর সাথে বিয়ে করা সম্পর্কে যে দলিল দিয়েছেন, (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে তালাকের পর ইদ্দতকাল পূর্ণ করার পর প্রাক্তন স্বামীকে কেবল এমন পরিস্থিতিতেই বিয়ে করা যেতে পারে যখন অন্য কোনো পুরুষের সাথে তার বিয়ে হবে এবং সে তাকে তালাক দিবে। কিন্তু এখন অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিয়ে হওয়া ছাড়াই প্রাক্তন স্বামীকে বিয়ে করা হয়। অতএব যেভাবে এই বিধানের ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়েছে ঠিক একইভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রেও মহিলাদের বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমার্জন হওয়া উচিত) এটি ভুল। পূর্বেও এমন কোনো নির্দেশ ছিল না আর এতে কোনো পরিবর্তনও সাধিত হয় নি। আপনি আপনার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তালাক সম্পর্কিত দুটি ভিন্ন নির্দেশের মাঝে গুলিয়ে ফেলেছেন।

অনুরূপভাবে বিধবার ইদ্দতের বিধান সম্পর্কেও আপনি ইসলামী শিক্ষামালা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নন। স্বামীর মৃত্যুর পর ইসলাম স্ত্রীকে চার মাস দশদিন শোক পালনের নির্দেশ দিয়েছে আর এক্ষেত্রে কোনো প্রকার ব্যতিক্রম রাখা হয় নি আর এই নির্দেশের মধ্যে বয়সেরও কোনো ছাড় দেওয়া হয় নি। কাজেই বিধবার জন্য আবশ্যক হল, তিনি ইদ্দতের এই সময়কাল যথাসম্ভব নিজের বাড়িতে অতিবাহিত করবেন। এসময় তিনি সাজগোজ করবেন না, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করবেন না, অর্থাৎ অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে (তার) বের হওয়ার অনুমতি নেই।

ইদ্দত পালনের সময় বিধবা (স্ত্রী) স্বামীর সমাধিতে দোয়া করতে যেতে পারবেন, তবে শর্ত হল, কবরটি যেন সেই শহরেই থাকে যে শহরে বিধবা (স্ত্রী) বসবাস করছেন। এছাড়া তার যদি ডাক্তারের কাছে যেতে হয় তাহলে এটিও অপারগতার মধ্যে পড়বে। অনুরূপভাবে কোনো বিধবার পরিবার যদি তার চকুরীর ওপর নির্ভরশীল হয় অথবা বাচ্চাদের স্কুল থেকে আনা-নেওয়া করতে হয় এবং বাজারসদাই করার জন্য তার অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এসব বিষয় অপারগতার গণ্ডিভুক্ত হবে। এমতাবস্থায় তার (অর্থাৎ বিধবার) জন্য আবশ্যক হল, তিনি সোজা বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রে যাবেন এবং কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আসবেন। অপারগতার কারণে বাড়ি থেকে বের হওয়ার এতটুকুই অনুমতি রয়েছে। কোনো ধরনের সামাজিক প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানাদিতে তার (বিধবার) যোগ দেওয়ার অনুমতি নেই। অতএব, শরীয়তের মধ্যে নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করার এবং নিত্য নতুন বিদাত (নববিধান) সৃষ্টি করার কোনো অধিকার কাউকে দেওয়া হয় নি।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু সেসব হাদীস সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নির্দেশনা লাভের নিবেদন করেছেন যে-সব হাদীসে যুদ্ধচলাকালীন, সাধারণ মানুষের ঝগড়াঝাটি এবং স্বামী-স্ত্রীদের মাঝে মীমাংসা করানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২৮ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: পবিত্র কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসে মিথ্যাকে 'আকবারুল কাবায়ের' (অর্থাৎ সবচেয়ে বড় পাপ) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর মহানবী (সা.) বার বার এটি পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

আপনার পত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েত বা হাদীসের যতটুকু সম্পর্ক, এমনই একটি হাদীস সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে আর এই হাদীসের বাক্যাবলী সতর্কতার সাথে দেখার ও ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এই হাদীসের বাক্যাবলী হল-

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি মানুষের মাঝে মীমাংসা করানোর উদ্দেশ্যে পুণ্যকথা বলে এবং ভাল কথা অগ্রগামী করে বা অন্যদের কাছে পৌঁছায় সে মিথ্যাবাদী নয়। এর উপমা এমন যে, আপোশ মীমাংসাকারী এক পক্ষ সম্পর্কে বিপক্ষ দলের বলা কথাবার্তার মধ্যে ভাল এবং উত্তম কথাগুলো অপরপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়

এবং সে পক্ষের বিরুদ্ধে বলা কথাবার্তা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করে তাহলে এমন মীমাংসাকারী মিথ্যাবাদী হতে পারে না।

সুনান তিরমিযী হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) কর্তৃক এই রেওয়ায়েতকে এমন বাক্যে বর্ণনা করেছে যে, অর্থাৎ তিনটি বিষয় ছাড়া মিথ্যা বলা বৈধ নয়। স্বামী তার স্ত্রীকে মানানোর জন্য কোনো কথা বললে। যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলা এবং মানুষজনের মধ্যে আপোশ মীমাংসা করানোর ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা।

প্রথম কথা হল, সুনান তিরমিযীতে বর্ণিত এই রেওয়ায়েত পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য রেওয়ায়েত পরিপন্থী হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। আর দ্বিতীয় বিষয় হল, ইসলাম কোনো ক্ষেত্রেই মিথ্যাকে বৈধ আখ্যা দেয় নি। বরং এর বিপরীতে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, প্রাণ চলে গেলে যাক কিন্তু সত্যকে হাতছাড়া হতে দিও না।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও এ সম্পর্কে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি (আ.) তাঁর পবিত্র গ্রন্থ নূরুল কুরআনের দ্বিতীয় নম্বরে একজন খ্রিষ্টানের এই একই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে লিখেন,

"পবিত্র কুরআন মিথ্যাকে প্রতিমাপূজার সমতুল্য আখ্যা দিয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

(অর্থাৎ, অতএব তোমরা .... প্রতিমাসমূহের নোংরামি এড়িয়ে চলো এবং মিথ্যা কথা বলা পরিহার কর, {কেননা তা প্রতিমাপূজা থেকে কম পাপ নয়,) সূরা আল হাজ্জ: ৩১} আসল কথা এটিই, কোনো হাদীসে আদৌ মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া হয় নি। বরং হাদীসে এই বাক্য বর্ণিত হয়েছে যে, إِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ ... {অর্থাৎ, যদি তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনেও পুড়িয়ে ফেলা হয় (তবুও মিথ্যা বলবে না।} এরপরও কোনো হাদীস যদি পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসের বিরোধী হয় তাহলে তা শ্রবণযোগ্য হবে না, কেননা আমরা সেই হাদীসকেই গ্রহণ করি যা সহীহ হাদীস ও পবিত্র কুরআন পরিপন্থী নয়। তবে, কোনো কোনো হাদীসে তওরীয়াহ (বা দ্ব্যর্থবোধক পরিভাষা) বৈধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে (এটিকে) মিথ্যা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আর একজন অজ্ঞ ও নির্বোধ যখন কোনো হাদীসে এমন দ্ব্যর্থবোধক বাক্য লেখা দেখতে পাবে তখন হয়ত একে সত্যিকার অর্থেই মিথ্যা ভেবে বসবে, কেননা সে এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনবহিত যে, সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ইসলামী (শিক্ষায়) অপবিত্র; অবৈধ এবং শিরকতুল্য। কিন্তু তওরীয়াহ (বা দ্ব্যর্থবোধক পরিভাষা) মিথ্যার আদলে হলেও তা মূলত মিথ্যা নয়। একান্ত অপারগ অবস্থায় সর্বসাধারণের জন্য হাদীসে এর বৈধতার অনুমতি পাওয়া যায়, কিন্তু তারপরও লেখা আছে যে, সেসব মানুষই উত্তম যারা তওরীয়াহ (বা দ্ব্যর্থবোধক পরিভাষা)-ও বর্জন করে।... কিন্তু বর্ণিত হাদীস ছাড়াও অন্যান্য এমন হাদীসও রয়েছে যা থেকে জানা যায়, তওরীয়াহ (বা দ্ব্যর্থবোধক পরিভাষা) উন্নত মানের তাকওয়ার পরিপন্থী আর অবশ্যই সুস্পষ্ট সত্যই উত্তম, যদিও একারণে হত্যা করা হোক বা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলাই হোক না কেন।"

(নূরুল কুরআন, দ্বিতীয় নম্বর, রূহানী খাযায়েন, নবম খণ্ড, পৃ: ৪০৩-৪০৫)

অতএব কোনো হাদীসে মিথ্যা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে- একথা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এসব হাদীসের মধ্যে যদি কোনোরূপ সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করা যায় যা কুরআন ও সুন্নত সম্মত হবে তাহলে সেই সামঞ্জস্যতার আলোকে আমরা এসব হাদীস গ্রহণ করব। নতুবা পবিত্র কুরআন এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সুস্পষ্ট শিক্ষা বিরোধী হওয়ার কারণে আমরা এসব হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করি না।

প্রশ্ন: মহিলাদের ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে মসজিদে এসে বসার এবং এই দিনগুলোতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা সম্পর্কে একজন মহিলার একটি পরামর্শের প্রেক্ষিতে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: উপরোক্ত দুটি বিষয় সম্পর্কেই ফিকাহশাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে আর ধর্মবিশারদরা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের আলোকে এ সম্পর্কে বিভিন্ন উত্তর প্রদান করেছেন।

একইভাবে জামা'তের বইপুস্তকেও আহমদী খলীফাদের বরাতে এবং জামা'তের আলেমদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উত্তর রয়েছে।

পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের আলোকে ঋতুবতী অবস্থায় মহিলাদের পবিত্র কুরআন পাঠ করা সম্পর্কে আমার মতামত হল, ঋতুবতী অবস্থায় মহিলাদের পবিত্র কুরআনের যে-সব অংশ মুখস্থ আছে তা ঋতুস্রাবের সময় যিকির ও আযকার হিসেবে মনে মনে আওড়াতে পারবে। এছাড়া প্রয়োজনে কোনো পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে পবিত্র কুরআন ধরতেও পারবে। কাউকে উদ্ধৃতি ইত্যাদি দেওয়ার জন্য অথবা সন্তানদেরকে কুরআন পড়ানোর জন্য পবিত্র কুরআনের কোনো অংশ পড়তেও পারবে, কিন্তু নিয়মিত বা যথারীতি তেলাওয়াত করতে পারবে না।

একইভাবে (ঋতুস্রাবকালীন) দিনগুলোতে কম্পিউটার ইত্যাদিতে, যেখানে তাকে বাহ্যত পবিত্র কুরআন ধরতে বা স্পর্শ করতে হয় না সেখান থেকেও যথারীতি তেলাওয়াতের অনুমতি নেই কিন্তু কোনো প্রয়োজনে অর্থাৎ কোনো উদ্ধৃতি খুঁজে বের করার জন্য বা কাউকে কোনো উদ্ধৃতি দেখানোর উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ইত্যাদির সাহায্যে পবিত্র কুরআন থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে, এতে কোনো সমস্যা নেই।

(ঋতুস্রাবকালীন) দিনগুলোতে মসজিদ থেকে কোনো কিছু আনার জন্য অথবা মসজিদে কোনো কিছু রাখার জন্য মহিলারা মসজিদে যেতে পারবে কিন্তু সেখানে গিয়ে বসতে পারবে না। যদি এর অনুমতি থাকত তাহলে মহানবী (সা.)ঈদে যোগদানকারিনী এমন মহিলাদের জন্য কেন এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তারা যেন নামাযের স্থান থেকে পৃথক জায়গায় বসে। কাজেই এমন অবস্থায় মহিলাদের জন্য মসজিদে বসার অনুমতি নেই।

এমন অবস্থায় যদি কোনো মহিলা মসজিদে আসে অথবা কোনো মেয়ে যদি এমন অবস্থায় তার মায়ের সাথে মসজিদে আসে অথবা হঠাৎ করে যদি কারও এই অবস্থা শুরু হয় তাহলে এরূপ পরিস্থিতিতে এমন মহিলা ও মেয়েরা মসজিদের নামায পড়ার স্থানে বসতে পারবেন না বরং নামায পড়া হয় না এমন কোনো জায়গায় তাদের বসার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রশ্ন: হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে গত ১৬ আগস্ট, ২০২০ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, কানাডার ন্যাশনাল আমেলার ভার্চুয়াল মোলাকাতে তরবীয়তের বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) আমেলার সদস্যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: মায়েদের মাধ্যমে (সন্তানদের) তরবীয়ত করুন অর্থাৎ, যে-সব মেয়েরা আজকাল এখানে পড়াশোনা করছে তাদের সাথে তাদের (মায়েদের) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়া উচিত। আর তাদের মধ্যে যারা এখানে বাইরে গিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে গিয়ে এবং কলেজে গিয়ে (সামাজিক মন্দ) প্রভাব গ্রহণ করে আর তাদের মায়েরা যদি পুরোপুরি শিক্ষিতা না হয় তাহলে তারা আপনাদের (আমেলার সদস্যাদের) কাছ থেকে সাহায্য নিবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করুন। আর মেয়েদের তরবীয়ত এমনভাবে করুন অর্থাৎ তারা যে বিষয়েই শিক্ষা গ্রহণ করুক না কেন, তারা যেন ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রগণ্য রাখার অঙ্গীকারটি দৃষ্টিপটে রাখে। শুধুমাত্র জগতের চাকচিক্যের পেছনেই যেন পড়ে না থাকে। এখানে তাদের এটি উপলব্ধি বা হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে যে, এখানে আসার কারণে আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে (তোমাদের প্রতি) যে কৃপা করেছেন সেসব কৃপার কারণে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশের দাবি হল, যতবেশি সম্ভব ধর্মের সাথে যুক্ত হয়ে যাও। অধিকাংশ মেয়েদের মধ্যেও এই (জাগতিকতার) প্রবণতা রয়েছে তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকেও মায়েদের উচিত (মেয়েদের) তরবীয়ত করা। এমনকি পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত অথবা কমপক্ষে তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেরাও মায়েদের প্রভাবাধীন হয়ে থাকে। (এ কারণে মায়েরা ছেলেদেরও তরবীয়ত করুন।) এছাড়া এজন্যও মায়েদের তরবীয়ত একান্ত অপরিহার্য অর্থাৎ পুরুষদের তরবীয়তের দায়িত্বও আপনাদেরকেই পালন করতে হবে। পুরুষদের মধ্যেও তরবীয়তের ঘাটতি রয়েছে। আমি একথা বলছি না যে, তারা (পুরুষরা) যা মন চায় তাই করে বেড়াবে আর মহিলারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে। (পুরুষদেরও) দায়িত্ব আছে। কিন্তু তরবীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও আপনাদেরকে এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে হবে যে, ছেলেদের মধ্যে, অল্পবয়স্ক আতফাল যারা রয়েছে তাদের তরবীয়তও এমনভাবে করুন যাতে তারা যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ায় যোগদান করবে তখন জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। একইভাবে মেয়েরা যখন নাসেরাত থেকে লাজনাতে পদার্পণ করবে তখন তারাও যেন জামা'তের সাথে যুক্ত থাকে। এখানকার (পাশ্চাত্যের) পরিবেশের যে কুপ্রভাব, কেননা এখানে অবাধ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কোনো কোনো বিষয়ে প্রকাশ্যে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 12 Oct, 2023 Issue No.41

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রশ্ন করা হয়। এ বিষয়ে তাদেরকে আপনাদের ভালভাবে বুঝিয়ে উত্তর দিতে হবে। এর পদ্ধতি হল, আপনারা একটি জরিপ করুন এবং একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে সবাইকে প্রেরণ করুন। প্রত্যেক মজলিসে যান এবং মেয়েদেরকে বলুন, প্রয়োজনে নিজের নাম গোপন রাখো কিন্তু তোমার মাথায় ধর্ম সম্পর্কে বা জাগতিকতা সম্পর্কে যে-সব প্রশ্ন আছে আর ধর্ম ও জাগতিকতার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আছে, কিংবা যদি (ধর্ম বিষয়ক) কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকে, তা লিখে দাও। এরপর লাজনাদের বিভিন্ন ফোরামে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। আর আমাকেও এখানে পাঠান। এখানেও আমরা কোনো প্রোগ্রাম বানাতে পারি। এমটিএ'তেও এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া আপনাদের ওখানেও এমটিএ-এর ষ্টুডিও বানানো হয়েছে, সেখানে আপনারা এমটিএর সাথে Coordinate বা সমন্বয় করে একটি প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারেন। আর লাজনারা একটি অনুষ্ঠান করুন আর তাতে নাম উল্লেখ না করে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিন যে, বর্তমানে এই এই ওংংঁববা সমস্যা দেখা দিচ্ছে বা সমাজে এই এই প্রশ্ন উঠছে। আর এ কারণে আমাদের (জামা'তের) কোনো কোনো মেয়ের মস্তিষ্কও চড়ষষঁঃববা দূষিত হচ্ছে। তাদের মনমস্তিষ্ককে আমরা কীভাবে পরিষ্কার করব (সেই চেষ্টা করতে হবে)। কাজেই এমন অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো নিয়ে আপনারা এমটিএ-তে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন আর কিছু এমন আছে যেগুলো করতে পারবেন না। সেগুলোকে Personal Level বা ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে তাদেরকে উত্তর দিতে হবে। এরপর নামবিহীন বিভিন্ন প্রশ্ন আসবে সেগুলোর উত্তর ইন্টারনেটে এমনভাবে রাখুন, এমন কোনো ফোরাম বানান যেখানে তরবীয়তের উদ্দেশ্যে এমনসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে। অতএব, বর্তমান যুগে এটি অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ যা মিডিয়া বা লোকজন (মানুষের মধ্যে) সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার জন্য উত্থাপন করছে। এরপর কেউ কেউ So-called বা উন্নত শিক্ষার নামে নিজেকে অনেক বড় শিক্ষিত জ্ঞান করে মনে করে যে, ইসলামী শিক্ষা সম্ভবত ইধপশ ডড়ৎফবা পশ্চাদপদ শিক্ষা। অথচ বর্তমান যুগে ইসলামী শিক্ষার চেয়ে আধুনিক শিক্ষা অন্য আর কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না যে শিক্ষা যুগের চাহিদার নিরিখে নিজেকে Adjust বা সমন্বয় করতে পারে।

******

(১ম পাতার শেষাংশ...)

তা'লা তোমাকে এই বাক্যটি উচ্চারণ করার আদেশ না দেন। অতএব এই আয়াতের অর্থ কেবল এতটুকু যে, মুসলমানরা নিজেদের শক্তিবলে এই জাতির সঙ্গে পেরে উঠবে না। বরং তারা এদের মোকাবেলা করবে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ ইচ্ছানুসারে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দাঁড় করাবেন।

এই আয়াতে মুসলমানদের সেই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন তারা এই সব জাতির উন্নতি দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়বে এবং তাদের মোকাবেলা করার জন্য তৎপরতা শুরু করবে। কিন্তু তারা এতে সফল হবে না। অপরদিকে এই আয়াতে সেই যুগে মুসলমানদের অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা কাজ করার পরিবর্তে আগামী দিনের আশা নিয়ে বসে থাকবে এবং সব সময় একথা বলতে থাকবে যে, আমরা আগামি দিনে এটা করে দেখাব। অর্থাৎ তাদের কর্মশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে; তাদের মধ্যে থাকবে কেবল হুমকি-ধমকি আর চমকানি দেওয়ার উদগ্রতা। সব সময় কাল শব্দটি উচ্চারণ করবে, সেই কাল কখনও আজ হবে না। তাই দেখুন, বর্তমান যুগে মুসলমান জাতির কর্মপন্থা থেকে এই সত্যটি এমনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যা দেখে দুঃখ হয় আবার বিস্ময়ও জাগে মনে।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ বলার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, যদি কখনও ভাবাবিষ্ট হয়ে এই সব জাতির মোকাবেলার চিন্তাও তোমাদের মনে উঁকি দেয়, তবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করো। খোদা তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন-একদিন মুসলমানদেরকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হবে এবং অদৃশ্য থেকে মুসলমানদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করবে। এই কারণে ঐশী পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন পরিকল্পনার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত।

هٰذَا رَشَدًا وَقُلْ عَسٰى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ - এতেও এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের বাহ্যিক পরিকল্পনা শত শত বছরেও এই জাতিগুলোকে ধ্বংস করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপা অচিরেই এমন উপকরণ সৃষ্টি করবে যার কল্যাণে তোমরা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাবে। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৪৩৯)

(ইশাআতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, নম্বর-১০, পৃ: ২৯২-২৯৩)

অতঃপর তিনি বলেন,

"ব্রিটিশ সরকারের এই শান্তি, সার্বিক স্বাধীনতা ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুস্তানের আহলে হাদীস সম্প্রদায় এই সরকারকে ভীষণভাবে বরদান হিসেবে মনে করে। আর এই সরকারের প্রজা হওয়াকে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রজা হওয়া থেকে শ্রেয় মনে করে। "

(ইশাআতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, নম্বর-১০, পৃ: ২৯২-২৯৩)

নাদওয়াতুল উলেমা' গোড়াপত্তনও সেই ইংরেজরাই করেছিল। তাদের পত্রিকা নাদওয়া লিখেছে-

"হিজ অনার অখণ্ড ভারতের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বাহাদুর দারুল স্বহস্তে উলুম নাদওয়ার গোড়া পত্তন করবেন বলে মঞ্জুরী প্রদান করেছিলেন। এই অনুষ্ঠান ১৯০৮ সালের ২৮ শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

(আননাদওয়া, সেপ্টেম্বর, ১৯০৮, নং-১১, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২)

উক্ত সংখ্যা যার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তার ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় আরবী ভাষণ রয়েছে যাতে স্যর জন বারস্কট কেসি এস আই ই-কে নাদওয়ার শিল্যান্যাসের অনুরোধ স্বীকার করার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

(আননাদওয়া, সেপ্টেম্বর, ১৯০৮, নং-১১, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২)

একথা উল্লেখ করার পরের অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য। অনুমান করা চলে, তাদের মনে এই খটকা লাগে, মুসলমানেরা একথা পড়ে বলবে, যে-নাদওয়ার ভিত্তি প্রস্তর ইংরেজ সরকার স্থাপন করেছে, ভবিষ্যতে তার অবস্থা কি হবে এর উদ্দেশ্যটাই বা কি? তাই তিনি এক ভয়াবহ কথা বলে গেছেন যা বলতে তিনি মোটেই কুণ্ঠিত হন নি। ..... একজন ইংরেজ দ্বারা গোড়াপত্তন করানোর সমর্থনে এবং এর ওকালতি করতে তিনি কেন এমনটি বললেন-

'এই প্রথম একজন অমুসলিমের হাতে একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করানো হচ্ছিল। (মসজিদ নববীর মিম্বরও একজন খৃষ্টানের হাতে নির্মিত হয়েছিল।)

(নাউযুবিল্লাহ্ মিনযালিক) যেহেতু তাদের মতে মসজিদে নববীর মিম্বরও খৃষ্টানের হাতে নির্মিত হয়েছে, তাই যদি 'নাদওয়া'-র গোড়পত্তনও খৃষ্টানের হাতে করানো হয়, তবে কি আসে যায়? কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে,

"وَنَحْنُ عَلٰى يَقِيْنٍ مِنْ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ كَمَا يُسْلِمُ اَذْعَانَهُمْ لِحُكُوْمَتِهِمْ يَزِيْدُوْنَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ النَّاشِئِيْنَ طَاعَةً وَانْقِيَادًا لِلْحُكُوْمَةِ- وَالْاٰنَ نُقَدِّمُ اِلٰى جَنَابِكُمْ اَزْكٰى التَّشَكُّرَاتِ حَيْثُ تَفَضَّلْتُمْ عَلَيْنَا بِقَطِيْعَةٍ مِنَ الْاَرْضِ لِنَرْفَعَ عَلَيْهَا قَوَاعِدَ مَدْرَسَتِنَا"

অনুবাদ: আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যেভাবে মুসলমানরা সরকারের প্রতি আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে তুলে রেখেছে,তারা এই সব ভাবী উলেমাদের (অর্থাৎ নাদওয়া থেকে পাস করে আলেম হওয়া) সৌজন্যে সরকারের আনুগত্যে আরও উন্নতি করবে। আর আপনি যে আমাদেরকে মাদ্রাসার ভিত স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক টুকরো জমি দান করেছেন, তার জন্য এখন আমি আপনার সমীপে কৃতজ্ঞতার অকৃত্রিম আবেগের বহিঃপ্রকাশ করছি।

"আননাদওয়া' জুলাই ১৯০৮, ৫ম খণ্ড, ১ম পৃষ্ঠায় একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য কি। তিনি বলেন,

'যদিও 'নাদওয়া' রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক, কিন্তু যেহেতু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য আলোকিত চিন্তাধারার উলেমা তৈরী করা এবং এই ধরণের উলেমাদের একটি জরুরী কর্তব্য এটাও যে, সরকারের কল্যাণ সম্পর্ক অবগত হওয়া এবং দেশে সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততার চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো।

(ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir